প্রকাশক : প্রতিমা প্রকাশনী
স্টেশন রোড, চুঁচুড়া, হুগলী।

প্রথম প্রকাশ :
আগস্ট ১৯৫৮

মুদ্রক : দীনবন্ধু দে
আর্ট প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, বড়বাজার, চন্দননগর, হুগলী

প্রাপ্তিস্থান :
ডি. এম লাইব্রেরি
৪২, বিধান সরণি, কলি-৬

দত্ত বুক ষ্টল
১৪ এ, টেমার লেন,
কলি-৯



ডাঃ তারকচন্দ্র ঘোষ, এম বি. বি. এস, ডি. টি. এম. এণ্ড এইচ., ডি. সি. এইচ, এম ডি. — হুগলী জেলার একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক। চিকিৎসা-কর্ম তাঁর পেশা, সাহিত্য-কর্ম তাঁর নেশা। এই নেশাটির অঙ্কুর ও বিকাশ বড়ো বিচিত্র। আলোকচিত্রটি তাঁর ২৩/২৪ বছর বয়সের।

ডাঃ ঘোষ ১৯৩০ সালের ১লা অক্টোবর তালচিনানে (চুঁচুড়া, হুগলী) জন্মগ্রহণ করেন এক নিম্নবিত্ত পরিবারে। পাঠ্যজীবন কাটে অনলস সংগ্রামে, ইস্কুলে-কলেজের পাঠ সাঙ্গ করে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে একের পর এক ডিগ্রি অর্জন করতে থাকেন। পরবর্তীকালে কৃতবিদ্য চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও দরিদ্র-জনসেবায় অধিকাংশ সময় ও শ্রম উৎসর্গ করেন। চিকিৎসা শুধু পেশা নয় সেবা-হিসাবে রূপ নেয়। এই সেবা-ধর্মে ব্যাপৃত থাকাকালীন তাঁর জীবনে আসে এক অভাবনীয় পরিবর্তন, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার পাশাপাশি ঐশ্বরিক চেতনাসমূহ ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হতে থাকে।

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ, তাঁর শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতীর নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন ১৯৫৮ সালে।

তাঁর এই দীক্ষা গ্রহণকে কেন্দ্র করে তৎকালে নানা সমালোচনা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, কিন্তু তিনি ছিলেন নির্বিকার ও স্থিরচিত্ত। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন ধার্মিক ও পরিচ্ছন্ন মনের মানুষ।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সচ্চিদ্‌জ্ঞান-চর্চায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও কৌতূহল দেখা দেয়। এই বিশ্ব-সংসার শুধু কী বাস্তবিক? তদূর্ধ্বে কিছু কী নেই? এ ব্রহ্মাণ্ড তবে কার নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে, কে তিনি? চলল অনুসন্ধান, পঠন-পাঠন। ভগবতগীতা অনুশীলন ও চর্চার ফলে রচিত হলো 'গীতা-রহস্য'। সরল ভাষায় লিখিত এ-গ্রন্থ সকল শ্রেণীর পাঠককে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। নিজে চিকিৎসক অর্থাৎ বিজ্ঞান-সচেতন ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও গীতার অলৌকিক মন্ত্রশ্লোকগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে যে বিনম্র দক্ষতার প্রকাশ ঘটেছে তা পর্বে পর্বে উন্মোচিত। এখানেই লেখক-হিসাবে তাঁর সার্থকতা। তিনি সেখানেই ক্ষান্ত না হয়ে উপনিষদ, গ্রন্থসাহেব, চণ্ডী প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থ হতে তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা আহরণ করে লিখলেন 'সাধন-সংকেত'—যা পূর্বেই প্রকাশিত।

নিজেকে জানার তো শেষ নেই এবং 'বিশ্বসাথে যোগে' যিনি অনুক্ষণ বিহাররত তাঁর করুণাঘন সান্নিধ্যলাভও বড়ো সহজ নয়। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সাধনা প্রয়োজন। দিনের কর্মযজ্ঞে সেই স্পৃহা দমিত থাকে বটে কিন্তু রাত্রিকালে, চরাচর যখন অন্ধকারে নিমগ্ন ও পরিপার্শ্ব নৈঃশব্দে নিস্তব্ধ, তখন এক বিস্ময়কর প্রেরণার স্রোত নেমে এসে তাঁর চিত্ত প্লাবিত করে দেয় এবং গানের খাতাটি আপনা-আপনি ভরে ওঠে বিচিত্র রচনায়। দৈব-প্রেরণা ছাড়া একে আর কি বলা যায়।

সুদীর্ঘকাল চিকিৎসা-বিদ্যা আহরণে ও বিতরণে নিযুক্ত থাকাকালীন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, বিশেষতঃ, সংগীত-রচনার মতো দুরূহ কর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন থাকার ফলে তাঁর এই অভিনব আত্মপ্রকাশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, তাঁর সমস্ত গানের মধ্যে একটি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ আছে যা কথা ও সুরের মাধ্যমে পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে পবিত্রতম অর্ঘ্যস্বরূপ। এই শ্রদ্ধার্ঘ্য শুধু কবিকেই নয় পাঠক ও শ্রোতা উভয় শ্রেণীর মানুষকে আকৃষ্ট ও আবিষ্ট করে। তাঁর সংগীত-রচনার সার্থকতা এইখানে।

এ-যাবৎ প্রকাশিত তাঁর বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় রচিত সংগীত-গ্রন্থের সংখ্যা—আট। বাংলা বইগুলি স্বদেশে ও ইংরেজি বইগুলি বিদেশে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। তাঁর অন্বেষার অন্য এক অভিপ্রকাশ, গদ্যের পাশাপাশি

গদ্যের চর্চা সেখানেও তিনি সুস্থির ও সুচিন্তিত। 'সাধন-সংকেতে'র পর রচিত 'ভক্তিযোগ-রহস্য' এবং তাঁর অল্পকাল পরে 'ধনলাভের উপায়'। তারপর 'গীতা-রহস্য'। অতি সহজ ও সরল ভাষায় এই গ্রন্থটি গীতা-মহান গ্রন্থের চাবিকাঠিরূপে গণ্য হবে। সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ সাধারণ মুমুক্ষু মানুষ এতে উপকৃত হবেন। এই সব গ্রন্থগুলি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে স্বল্প মূল্য, শীর্ণকায়, কিন্তু বিষয়-বৈভবে উজ্জ্বল ও বক্তব্যে দ্যুতিময়।

ডাঃ ঘোষ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সঙ্গে চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে যুক্ত করে ভক্তি ও যুক্তির সমন্বয়ে চিত্তের যে বিপুল বিস্তার ঘটিয়েছেন, মানব-প্রেম ও জাগতিক ক্রিয়াকলাপ অতি-নিকট হতে প্রত্যক্ষ করার ফলে সত্যদর্শী'র মতো একাধিক বাস্তব ঘটনাকে কাহিনী-আকারে সুগ্রথিত করেছেন। 'রোগী ও রহস্যের' ভূমিকায় তিনি নূতন। এর কাহিনীগুলি চিকিৎসাকালীন সত্য-ঘটনাবলীর উপর নির্ভর, চিকিৎসকের নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখেছেন, বুঝেছেন এবং চিন্তা করেছেন—প্রত্যেকটি কাহিনী দাঁড়িয়ে আছে সেই এক স্থিরভূমিতে যার নিয়ন্তা স্বয়ং ঈশ্বর। বর্তমান গ্রন্থ 'আরো রোগী আরো রহস্য' আটটি গল্পের সংকলন। এই গল্পগুলিও বাস্তব-নির্ভর এবং সত্য-কথনে উদ্‌ভাসিত। পূর্ব গ্রন্থের ধারা অনুযায়ী। ছোটগল্পের পরিসর, পদ্ধতি ও প্রকরণ যথাযথ রক্ষিত হয়েছে বলেই আখ্যানগুলির মধ্যে নীতিকথার উঁকি থাকলেও রীতিগত ঐক্য বজায় আছে—সার্থকতা এখানেই।

সম্রাট সেন

ডক্টর তারকচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

* ইংরাজি কাব্যগ্রন্থ :

Geeta-Manjari

Geeta-Sudha

Vijoy-Geeti

সংগীত-গ্রন্থ

গীত-মঞ্জরী ১ম খণ্ড : স্বরলিপিসহ

গীত-মঞ্জরী ২য় খণ্ড

গীত-মঞ্জুষা ১ম খণ্ড

গীত-সুধা ১ম খণ্ড

গীতশ্রী (স্বরলিপিসহ)

প্রবন্ধের বই :

সাধন-সংকেত (যোগ সাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব)

ভক্তিযোগ-রহস্য

ধনলাভের উপায়

গীতা-রহস্য

রহস্যময় সত্য কাহিনী :

রোগী ও রহস্য

প্রাপ্তিস্থান :

* W. Newman & Co. Ltd.

3, Old Court House Street,

Calcutta-1

মহেশ লাইব্রেরি

২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

জয়গুরু পুস্তকালয়

১২/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩

বাণী লাইব্রেরি ৫৪/৭ কলেজ স্ট্রীট, কলি-৭৩

সূচীপত্র

কুড়ানো ছেলে	১
অগ্রদূত	২২
স্বপ্নদর্শন	২৯
অলৌকিক সত্তা	৩৮
দিগ্‌ভ্রম	৪৩
আংটির প্রত্যাবর্তন	৫০
অনুসন্ধান	৬৬
ছেলে-চোর	৮০

এক

কুড়ানো ছেলে

উদারচেতা উদয়নারায়ণ সিংহরায় তৎকালিক ইংরেজ-আমলে ক্ষমতাশীল জমিদার-মহলে এক পরিচিত নাম। তাঁর তেজঃদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন ছিল প্রজাদের জন্য নিবেদিত। প্রজাদের উন্নতিসাধনে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তাই তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্ভ্রমের পাত্র। তাঁর অভিজাত বাড়ি, জুড়ি গাড়ি ইত্যাদি ছিল আকর্ষণের সামগ্রী। লোক-লস্কর, দাস দাসী ছিল অগুনতি। এক কথায় তিনি ছিলেন ধন-যশ-রূপের ঈর্ষাযোগ্য পুরুষ। কিন্তু বাধ সাধল বিধিলিপি। নইলে এ-হেন জমিদারের ভোগে অরুচি হবে কেন? স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দান করলেন প্রজাদের। নিজে গেরুয়া-কাপড় প'রে পা বাড়ালেন অজানা পথে। ভারতী প্রেক্ষাগৃহে যে ছবি দেখে বন্ধু দীপঙ্করের সঙ্গে বাইরে এলাম, এ তারই সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

আসছিলাম বন্ধুর মোটরে আর ভাবছিলাম, জমিদারবাবু কী এমন গুপ্তধনের সন্ধান পেলেন, যার জন্যে তিনি পার্থিব ভোগসুখে দিলেন জলাঞ্জলি?

লোয়ার সারকুলার ও চৌরঙ্গী রোডের মোড়ে আমাকে নামিয়ে দিয়ে দীপঙ্কর চলে গেল তার লী রোডের বাড়িতে। ঘড়িতে তখন বাজে সন্ধ্যো সাতটা। শীতকাল। কাছাকাছি কোন লোকজন নজরে পড়ল না। একাকী দাঁড়িয়ে রইলাম পিচঢালা রাস্তার উপর হাওড়াগামী বাসের অপেক্ষায়।

তখন অবিশ্যি কলকাতার পেট চিরে পাতাল রেলের কাজ আরম্ভ হয় নি। তাই ধর্মতলা-টালিগঞ্জ-বালিগঞ্জ রুটের ট্রাম ঐখান দিয়েই যাতায়াত করত। হ্যাঁ, আর একটা কথা বলে রাখা ভাল। লোড্-সেডিং-এর পরওয়ানা তখনও জারি হয়নি। রাস্তার আলো বেশ তেজের সঙ্গেই জ্বলছিল। তবে আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম সেখানটা আবছা অন্ধকার। ট্রামলাইন আমার পিছনে, তবে একটু তফাতে। এই পর্যন্ত আমার বেশ মনে আছে।

ডাইনে ঘাড় কাত করে দূর থেকে নজর করছি, কোন্ বাসটা হাওড়া ষ্টেশন যাবে। এমন সময় পেছন থেকে আচমকা একটা জোর ধাক্কা।

হঠাৎ ব্রেক কসে-যাওয়া গাড়ির আরোহীর মত সামনের দিকে কয়েক-পা পিছলে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। কোনমতে পতনের তালটা সামলে নিলাম। পেছন পানে তাকিয়ে দেখি, একটা ট্রাম ঝড়ের মতো চলে যাচ্ছে আমার গা ঘেঁসে। ঢং ঢং শব্দে কানে তালা লেগে গেল। দমকা বাতাস গায়ে লাগল। আমি শিউরে উঠলাম।

পাশেই এক যুবককে দেখতে পেলাম। বয়েস আন্দাজ কুড়ি-একুশ। কালো-রঙের স্যুট পরা। বলিষ্ঠ চেহারা। ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হল না। অসাবধানবশত ট্রাম রাস্তার উপর দাঁড়িয়েছিলাম। নিশ্চিত মৃত্যুর হাতছানি আর কী।

আবেগে আনন্দে ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। সাধুবাদ জানিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'তোমার নাম কী?'

'সুমঙ্গল হালদার'। মিষ্টি গলার স্বর।

নাম শুনে আমি যেন হোঁচট খেলাম। আলো-অন্ধকারে সুমঙ্গলকে আবছা দেখছিলাম। ছুটন্ত গাড়ির জোরালো আলোকে তাকে ভাল করে দেখবার সুযোগ ঘটল। কপালের ডানদিকে জলজলে ক্ষতচিহ্ন, উপরের ঠোঁট কাটা (Hare lip). চোখ দুটো টানাটানা আর মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুলের বাহার।

হকচকিয়ে গেলাম। আর কিছু জিগ্যেস করবার ফুরসুৎ পেলাম না। সুমঙ্গল লাফ দিয়ে চলন্ত ডবলডেকার বাসে। অন্তরটা হাহাকার করে উঠল। বিস্মৃতির অন্ধকার ঠেলে চোখের পর্দায় ফুটে উঠল কুড়ি-একুশ বছর আগেকার একটা ছবি।

* * *

'বিষ্যুদবার। বারবেলা। কাছের রাস্তা নয়। ফিরতে রাত্তির হবে। যদি কোন অমঙ্গল ঘটে।'—কথাগুলি বললেন আমার মা।

আমি বলি, 'হ্যাঁ মা। অনেক দূর। মেমারী থেকে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মাইল। অজ পাড়াগাঁ। তবে আমার বিশ্বস্ত বন্ধু ত রয়েছে। গুলি ভরে নিয়েছি। ভয় কী?'

মা হাত নেড়ে বললেন, 'না না। তা হবে না, বাছা। ওটা বাড়িতে রেখে যা। ঈশ্বরের উপর চাই ষোল আনা বিশ্বাস। তবেই ত তিনি আপদে-বিপদে রক্ষে করবেন।'

পড়লাম ফাঁপরে। ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করবার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। সে যোগ্যতা আমার কই? তাই বললাম, 'যোগীর

এখন-তখন অবস্থা। শহরের বড়-বড় ডাক্তার দেখে, সবাই জবাব দিয়েছেন। রোগীর বিশ্বাস, আমি তাঁর চিকিৎসা করলে তিনি নাকি সেরে উঠবেন। সকলেই ত তোমার সন্তানতুল্য। শেষ সময় তোমার সন্তানের পাশে দাঁড়ালে, অমঙ্গল হবে কেন?'

মা কথার কোন জবাব দিলেন না। বুঝলাম, মৌনতা সম্মতির লক্ষণ। মায়ের পায়ে প্রণাম রেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম।

তখন শীতকাল। খাটো বেলা। ফিরতি পথে গাড়ির চালক পরেশকে নির্দেশ দিলাম, 'জোরে চালাও'।

কখন যে সূর্যদেব শেষ রশ্মি ছড়িয়ে দিগন্তের কোলে ঢলে পড়েছে, টের পাই নি। হুঁস হল, যখন পরেশ হঠাৎ ব্রেক কষল।

চমকে উঠে শুধাই, 'কী হল?'

'চাকা পাংক্চার।'

গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। পরেশ চাকা বদলাতে হাত লাগাল। আমি একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। একে ত মেটে রাস্তা। তার উপর এবড়ো-খেবড়ো। খানিকটা সময় নষ্ট হবে। মায়ের মুখে শোনা 'অমঙ্গল' শব্দটা মনের ভেতর এতক্ষণ কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিল। এবার সেটা সুযোগ বুঝে উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করল। মনটা একটু দমে গেল।

মায়ের আশীর্বাদ কোনদিন নিস্ফল হয় না। —এই ভেবে মনটাকে একটু চাঙ্গা করে চারধার চোখ বুলাতে লাগলাম।

নীরব নিস্তব্ধ ভরসন্ধ্যেবেলা। কাছাকাছি লোকবসতির চিহ্ন নেই। বাঁপাশে বিরাট জঙ্গল। ডানদিকে মজে-যাওয়া পুকুর। কচুরিপানা ঢাকা। তার তিন ধারে ঝোপঝাড়, উঁচু নিচু গাছের সমারোহ। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ডালপালাযুক্ত লম্বা-লম্বা গাছগুলো দেখে মনে হল, জটাধারী মৌন তাপস সান্ধ্য তপস্যায় মগ্ন। অদূরে কয়েকটা ছেঁড়া বালিশ, তুলো আর কাপড়ের টুকরো এলোমেলোভাবে ছড়ানো। ভক করে একটা পচা গন্ধ নাকে ঢুকল। গা-টা ঘিনঘিন করে উঠল। একটা ছোট্ট করোটি দেখে বুঝলাম, এটা অন্তিমের আশ্রয় শ্মশান-টশান হবে।

শ্মশানের নৈঃশব্দ্য ভেদ করে হঠাৎ একটা শব্দ, ঝপঝপ। গা-টা ছমছম করে উঠল। দেখি মাথার উপর দিয়ে সারাদিন উপোস-করা কয়েকটা বাদুড় উড়ে গেল। যাক্ বাঁচোয়া।

শ্মশানের দিকে তাকিয়ে একমনে ভাবছি, হায় মানুষ কত অজ্ঞান!

নিজেদের মধ্যে কাল্পনিক ভেদরেখা টেনে সৃষ্টি করেছে, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ ইত্যাদি। শ্মশানের পুণ্যভূমিতে কিন্তু সবাই সমান। অহংকার অভিমান হয় চূর্ণ-বিচূর্ণ। তবুও মানুষ নিন্দা-ঘৃণা-ছলনা করতে ভোলে না। কী আশ্চর্য!

ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। এমন সময় বুকের ভেতরটা ছাঁৎ করে উঠল একটা শব্দ শুনে, ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ।

পরেশকে শুধাই, 'কিসের শব্দ রে?'

সে বলল, 'বাচ্চার।' চোখে তার ত্রস্ত চাউনি।

আবার একটা আওয়াজ, ঘেউ ঘেউ। পরেশ আর কোন কথা না বলে চাকা বদলাতে লাগল। মনে হল সে ঘাবড়ে গেছে।

কৌতূহলী হয়ে আমি টর্চ জ্বালালাম। শব্দ লক্ষ্য করে জঙ্গলের দিকে পা বাড়ালাম।

এদিক-ওদিক আলো ফেলে দেখতে পেলাম একটা সরু পায়ে-চলা রাস্তা। সর্পিল গতিতে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেছে। দুধারে কাঁটাগাছের ঝোপ। গুটি গুটি এগুতে লাগলাম। ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দ থেমে থেমে হতে লাগল। এত নিবিড় বন যে তিন-চার হাত দূরে কি আছে দেখতে পাচ্ছিলাম না। ঝিঁঝিঁপোকার একটানা শব্দে কান ঝালাপালা। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও কিছু দেখতে পেলাম না। পা দুটো যেন অবশ হয়ে গেল। হিমেল হাওয়ার বিদ্রূপ ধ্বনি, 'অমঙ্গল, অমঙ্গল'। গলা শুকিয়ে কাঠ। রগ দিয়ে ঘাম গড়াতে সুরু করেছে। মাথা চক্কর দিতে লাগল। তখন মনে হল, ঝোঁকের মাথায় এতদূর এসে ভুল করেছি। ভালয় ভালয় ফিরতে পারলে, বাঁচি।

ফিরবো বলে যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছি শুনতে পেলাম একটা ক্ষীণ শব্দ, খস্ খস্। সেইদিকে আলো ফেললাম। দুটো শেয়াল। ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে আছে। আলো দেখে লুকিয়ে পড়ল। ঐদিকে একটু এগিয়ে গেলাম। দেখতে পেলাম ঝোপের পাশে এক ফালি ফাঁকা জায়গা। লম্বা লম্বা সবুজ ঘাসে ঢাকা। হাত-চারেক দূরে পুকুর। পাড়ে একটা বড় মোটা শিমুল গাছ। ডালপালা জলের উপর ঝুঁকে পড়েছে। এতক্ষণ ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দ থেমে ছিল। আবার শুনতে পেলাম। আলো ফেললাম।

একটা দেশী মড়া-খেকো কুকুর নজরে পড়ল। কালো, তবে গলার কাছটা সাদা। চোখের কোটরে বসানো দুটো লাল পাথরের গুলি। টর্চের

আলোয় চকচক করে উঠল। সে সামনের ঠ্যাং দুটো উঁচু করে বসে ছিল। জিবটা আধখানা বের করা। লেজ গুটোনো। আমায় দেখে সে ঘেউ ঘেউ করে থেমে গেল। কুকুরটার কাছে গেলাম। শিমুল গাছের গুঁড়ির উপর আলো ফেললাম? দেখি, গুঁড়ির আড়ালে একটা সাদা কাপড়ের পুঁটলি। এগিয়ে গেলাম। দেখি এক বীভৎস দৃশ্য।

পুঁটলিতে রক্তের ছোপ। খানিকটা অংশ ছেঁড়া। সেখান দিয়ে বেরিয়ে এসেছে এক নবজাত শিশুর মাথা নাভি পর্যন্ত। কপালের ডানদিকে খুবলান। রক্ত চোয়াচ্ছে। উপরের ঠোঁট কাটা (হেয়ার লিপ)।

তড়িঘড়ি শিশুকে পুঁটলি থেকে বের করলাম। হৃষ্টপুষ্ট বাচ্ছা ছেলে। মাথায় পাতলা কালো চুল। চোখ দুটো বোজা। চোখের পাতায় জমাট রক্ত। নাভি থেকে অল্প অল্প রক্ত ঝরছে। বুঝলাম, নাড়ি কাটবার সময় ভাল করে বাঁধা হয়নি।

আস্তে আস্তে বাচ্ছাটাকে তুলে নিলাম। পিছলে যাচ্ছিল। রক্তমাখা ন্যাকড়া দিয়ে জড়িয়ে নিলাম। কুকুরটা এতক্ষণ আমাকে এক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল। এবার সে লম্বা মুখটা উপর দিকে তুলল। ঘেউ করে ডেকে উঠল। ধনুকের মত বেঁকে দাঁড়াল। আড়মোড়া ভেঙে লেজ নাড়তে লাগল।

বাচ্ছাটাকে নিয়ে অতি সন্তর্পণে জঙ্গল থেকে বাইরে এলাম। কুকুরটাও পিছু পিছু এলো নিঃশব্দে। গাড়িতে উঠে বসলাম। বাচ্ছাটাকে কোলের উপর চেপে ধরলাম। সে ট্যাঁ ট্যাঁ করে ককিয়ে উঠে থেমে গেল। পরেশ গাড়িতে স্টার্ট দিল। কুকুরটা ভৌ ভৌ শব্দে আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাল।

ধুলো উড়িয়ে গাড়ি ছুটতে লাগল। মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি খেতে হচ্ছে। আর আমি ভাবতে শুরু করেছি, একটা জলজ্যান্ত বাচ্ছা শ্মশানে কেন কুকুর শিয়ালের খাদ্য হল? তবে কী মৃত ভেবে ফেলে দেওয়া হয়েছে? তাই যদি হয়, অগ্নিসংস্কার বা মাটিতে কবর দেওয়া হল না কেন? তবে কী অবাঞ্ছিত সন্তান? নিজেদের কলঙ্কের বোঝা অসহায় নিরাপরাধ লোকের ঘাড়ে চাপানো ত সভ্য-সমাজের রীতিনীতি। এটা সেরকম কোন ব্যাপার নয় ত?

গাড়ির ঝাঁকুনিতে বাচ্ছাটা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল। ধরে ফেললাম। আবার ভাবতে লাগলাম, কুকুরটার কী মতলব ছিল? রক্ষক না ভক্ষক?

নিশ্চয়ই রক্ষক। শেয়াল দুটাকে কাছে ঘেঁসতে দেয়নি। সে যদি না থাকত, শিশুর কচি নরম-দেহটা সাবাড় করে দিত শিয়ালে। তাছাড়া সে ত আমায় দেখে আহ্লাদে লেজ নাড়ছিল। বদ মতলব থাকলে সে নিশ্চয়ই প্রতিরোধ করত।

শিশুটা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। আবার তার ট্যাঁ অঁ্যা অঁ্যা কান্না। বোতল থেকে জল নিয়ে আঙুলে করে ফোঁটা ফোঁটা মুখে দিলাম। সে চুপ করল।

বাড়ি ফিরে নবজাতকের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার সু-ব্যবস্থা করলাম। অল্পদিনের মধ্যে সে সেরে উঠল। কিন্তু কপালের ডান দিকে রয়ে গেল বড়ো-রকমের আঘাতের চিহ্ন (scar mark)।

শিশুটাকে নিয়ে কয়েকদিন বেশ শান্তিতেই কাটল। গেরামের বহু মেয়ে-পুরুষ এসে দেখে গেল। হঠাৎ ঘটে গেল এক অভাবনীয় ঘটনা। কিছুলোকের বৈষয়িক ক্ষতি হল। আর যায় কোথায়? দোষ হল নির্দোষী অনাথ শিশুর উপর। সকলে একবাক্যে বলতে শুরু করল, শিশুটা 'অমঙ্গল'। রাস্তাঘাট, আড়ালে-আবডালে পাড়া-পড়শীর আলোচনার খোরাক হল এই কুড়িয়ে-পাওয়া শিশু। নানাজনের নানা কথা। সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। মোদ্দা কথা হল নিষ্পাপ ছেলেটাকে আবার উদ্বাস্তু করা। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি বিমূঢ়।

একদিন সকালে দেখি, আমাদের বাড়ির উঠোনময় হাড়ের ছোট ছোট টুকরো, ইঁট, চুল, ন্যাকড়া, কাগজ-কুচি ইত্যাদি ছত্রাকার পড়ে আছে। আমি আশ্চর্য হলাম। গেরামের অন্যান্য বাড়িতেও এরকম উপদ্রব শুরু হল। এগুলো পড়ত রাতের অন্ধকারে। রাতে পাহারা চললো। কিন্তু কাকেও ধরা গেল না। তখন গেরামশুদ্ধ সবাই ধরে নিল, এটা কোন প্রেতাত্মার কাণ্ড। সকলে ভয়ে শঙ্কিত। সন্ধ্যের পরই সকলের বাড়ির দরজা বন্ধ হল। উপদ্রব আরও বেড়ে চললো। ওঝা গুণিন ডাকা হল। তারা এসে হাত চালল। বলল, 'এ ভূতের কাজ।' মন্ত্রবলে ভূত তাড়াবার ব্যবস্থা করল। চাঁদা করে প্রচুর টাকা দেওয়া হল তাদের। তেলে সিঁদুর মিশিয়ে মন্ত্র পড়ল। ডেকে ডেকে গেরামের সকলের কপালে তেল-সিঁদুরের টিপ দেওয়া হল। বাড়ি ও গেরামের চারিদিকে মন্ত্রপূত লাঠি দিয়ে দাগ কাটা হল। সরষে-পড়া ছিটানো হল। তাদের ভাষায় ওকে বলে 'গৃহবন্ধন'

ও 'গ্রামবন্ধন'। এতে কয়েকদিন ভূতের উৎপাত বন্ধ রইল বটে। তারপর যাকে তাই। মাঝ থেকে চার পাঁচশো টাকা দণ্ড।

একদিন শুনলাম, গেরামের বিষ্টুদাসের দ্বিতীয় পক্ষের বউ কমলাক্ষীর ভর হচ্ছে! হালে বিয়ে করা। তাঁর মুখে সব বিস্তান্ত ব্যক্ত হয়েছে। আমার শ্মশান থেকে আনা শিশুটা নাকি ভূতের বাচ্চা। মামদো ভূতের। সে থাকে শ্মশানের শিমূল গাছে, যেখান থেকে শিশুটাকে আমি নিয়ে এসেছি। বাচ্চাটাকে চুরি করে আনবার জন্যেই নাকি তার রোষ।

শুনে, আমি একেবারে থ। গাঁয়ের লোক কুসংস্কারকে যে এতখানি প্রশ্রয় দিতে পারে, কল্পনা করতে পারিনি।

আমি সকলকে ডেকে বোঝাবার চেষ্টা কবি, ভূতটুত বাজে। এরকম দৌরাত্ম্য মানুষ ছাড়া কেউ করতে পারে না। কেউ বুঝল, কেউ বুঝল না।

যাই হোক, ব্যাপারটা অনুসন্ধান করবার জন্যে একদিন হাজির হলাম বিষ্টুদাসের বাড়ি। বিষ্টুবাবুর পোষাকী নাম, বিষ্ণুপদ দাস। বয়েস চল্লিশের কোঠায়। মেদবহুল চেহারা। উঠতি বড়লোক। তাঁর স্ত্রী কমলাক্ষী বসে আছে বারান্দায় শতরঞ্জির উপর। বয়েস আর কত, বড়জোর কুড়ি-বাইশ। বয়সের পার্থক্যটাই আমার প্রথম নজরে পড়ল। তবে তেজালো দেহ। যৌবনের সূক্ষ্ম কারুকার্য সুস্পষ্ট। মাথার চুল এলোমেলো। সিঁথির সড়কে সিঁদুরের রক্তিম রেখা। ঝকমকে রোদ পড়ে চিক্‌মিক্ করছে। আঁচল লম্বা হয়ে লোটাচ্ছে মেঝের উপর। চোখ দুটো ঈষৎ লালচে। তাতে পাগলের মতো চাহনি। মুখে ক্লান্তির ছাপ। চারদিকে মেয়ে-পুরুষ গিসগিস করছে। সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি কমলাক্ষীর উপর। আমি ভদ্রমহিলাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

হঠাৎ সে খিলখিল করে হেসে উঠল। দুচোখে আশ্চর্য ভঙ্গি। তারপর তার পুরুষের মতো গুরুগম্ভীর গলা শুনে চমকে উঠলাম। গড়গড় করে কিছু আরবী শব্দ উচ্চারণ করল। মানে কিছুই বুঝলাম না। অল্পক্ষণের জন্য চুপ করল। নড়েচড়ে বসল। ডান হাতটা আমার দিকে তুলল। ঝকঝকে দাঁতগুলো বের করে বলতে শুরু করল, 'আমার বাচ্চা তোদের গেরামের ডাক্তারবাবুর বাড়িতে।' বারবার এই একই কথা আওড়াল। তারপর হঠাৎ সে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। ক্রুদ্ধস্বরে তড়পাতে লাগল, 'শিগগির শিমুলতলায় রেখে আয়। ট্যাণ্ডাই-মণ্ডাই করলে তোদের গুঁড়ো করে ফেলব।' এরকম আলাং-ফালাং অনেক কথা বলল। শেষে বলে উঠল,

'এখন যাচ্ছি। আবার আসব।' কমলাক্ষী চিৎ হয়ে পড়ে গেল। বিষ্টুবাবু ধরে ফেললেন। মনে হল বেহুঁশ। দেহ যেন শক্ত কাঠ। বিষ্টুবাবু চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিলেন। তারপর কমলাক্ষী ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল।

বিষ্টুবাবু তারপর আমার কাছে এগিয়ে এলেন। বিশাল দেহ। ইয়া বড় গোঁফ। এক মুখ দাড়ি। কদম-ছাঁট চুল। পরনে খাটো-বহরের মোটা ধুতি। গায়ে গেঞ্জি। কোমরে লাল রঙের গামছা জড়ানো। পায়ে চপ্পল।

আমার দিকে চোখ দুটো বড় বড় করে তাকিয়ে বললেন, 'এখন শুনলেন ত ডাক্তারবাবু। ভালয় ভালয় ছেলেটাকে বিদেয় করুন। নাহলে আপনিও মরবেন তার সঙ্গে গেরামসুদ্ধু।' উত্তেজনা ও ক্রোধে তিনি ফুলতে লাগলেন!

আমি শান্তস্বরে বললাম, 'ভূতের ভরটর বাজে। আপনার স্ত্রীর হয়েছে মনোরোগ, যাকে বলে হিস্টিরিয়া।'

বিষ্টুবাবু চড়া গলায় বললেন, 'রোগ যদি হবে, আমার স্ত্রী এত খবর জানল কী করে? মৌলবি সাহেব ত বলেছেন, আরবী ভাষায় কথা বলছে। বাড়ি বাড়ি হাড়গোড় কে ফেলছে? আপনারা বুকে নল ঠেকিয়ে যদি সব রোগ ধরতে পারতেন, তাহলে দুনিয়ায় কেউ আর মরত না। আবার বলছি ছেলেটাকে বিদেয় করুন। নাহলে আমরাই সে কাজ করব।'

ইতিমধ্যে কয়েকজন ওঝা এসে পড়ল। নানারকম আজগবী মন্তর আওড়াল। কমলাক্ষীর গায়ে ধুলো পড়া ছুঁড়ে দিল। যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করল। তারপর হাড়-পাঁজর বের-করা এক ওঝা বেশ জরালো কণ্ঠে বলতে শুরু করল, 'এ হল মামদো ভূত। তার বাচ্চাকে ধরে আনা হয়েছে। সেই আক্রোশে সে গেরামের উপর চড়াও হয়েছে। একে আমরা তাড়াতে পারব না। তার বাচ্চাকে ফেরত দিলে, তবেই সে চলে যাবে।'

সকলে উত্তপ্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। অস্বস্তি বোধ করলাম। বুঝতে পেরেছি পুরো ব্যাপারটা বুজরুকি। কিন্তু এতজনের কোপদৃষ্টির সামনে দাঁড়াই কি করে? ভারতের মতো অনুন্নত দেশের লোক অলৌকিক ঘটনা, অস্তিত্বহীন ভূতপ্রেত, ওঝা-গুণিনের অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রভৃতিতে বিশ্বাসী। এদের মন থেকে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের ভূত ছাড়ান অসম্ভব। মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। বৃথা তর্কের মধ্যে না গিয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়লাম।

বাড়ি ফিরে দেখি, এক প্রবাসী বাঙালী-দম্পতি আমাদের বাড়ি হাজির। ভদ্রলোকের নাম বিনয় হালদার। বয়সের বেলা পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। বিনয়ী, হাসিখুশি মিশুকে। তাঁর স্ত্রী ঈশানীর স্বাস্থ্য ভাল। থমকানো যৌবন। এখনও পর্যন্ত কোন সন্তান-সন্ততি হয়নি। তাই অন্তরে মাতৃত্বলাভের চাপা ক্রন্দন। বেনারসে থাকতে এক ধরমশালায় তাঁদের সঙ্গে আমার আলাপ। কলকাতায় এলে, আমাদের বাড়ি আসবার আমন্ত্রণ করেছিলাম। তাই এই হঠাৎ আগমন।

আমার মুখে 'অমঙ্গল' শিশুটার বিত্তান্ত শুনে ভদ্রমহিলার মধ্যে যেন মাতৃভাব জেগে উঠল। কোন কথা না বলে তিনি শিশুটাকে কোলে তুলে নিলেন। চেখে-মুখে স্বস্তির ছায়া পড়ল। শিশুর একমাথা চুল, টানাটানা চোখ আর চাঁদপানা মুখের শ্রী বোধ হয় বিনয়বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তিনি আপত্তি করলেন না।

রাত্রে আমি ও হালদার-দম্পতি একসঙ্গে খেতে বসলাম। কেষ্ট আমাদের পরিবেশন করতে লাগল। ঈশানী রান্নার তারিফ করলেন।

খাওয়া-দাওরার পর আমরা বারান্দায় এসে তক্তপোষের উপর বসলাম। দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজল দশটা।

ঈশানী মুখ তুলে বললেন, 'একটা কথা কিন্তু বুঝতে পারছি না।'

আমি জিগ্যেস করি, 'কী? বলুন বউদি—'

তিনি বললেন 'বাচ্ছাটার কী দোষ? ওরা তাড়াতে চাচ্ছে কেন?'

বিনয়বাবু যোগ করলেন, 'আপনি ত বেশ উটকো ঝনঝাটে পড়েছেন দেখছি।'

আমি বলি, 'জীবন ত নাটকের মতো নিছক কল্পনা নয়। এটা বাস্তব সত্য। ঝুট-ঝামেলার মধ্য দিয়ে এই সত্যকে যাচাই করে নিতে হয়। আর এর জন্য দরকার হয় অসীম ধৈর্য। ধৈর্য-ই হলো মানুষের মনুষ্যত্ব। তবে বাচ্ছার পিছু কেন লেগেছে, সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

বউদির জিজ্ঞাসা, 'এ-সব সত্যি সত্যি কী ভূতের কাণ্ড, না অলৌকিক ব্যাপার?'

আমি দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলাম, 'ভূতটুত বাজে। ওদের কোন অস্তিত্বই নেই। আসলে এ-সব কাজ করছে কোন দুষ্ট লোক। তাকে ধরতে পারলেই প্রকৃত রহস্য জানা যাবে। আর অলৌকিক! ওটা স্রেফ বুজরুকি। এ-হলো অসহায় নিপীড়িত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের বাঁচার জন্য শেষ ভরসা বা

আশ্রয়। ধান্দাবাজ লোক অলৌকিক বলে যেটা চালায়, সেটা হাত-সাফাই ছাড়া কিছুই নয়। আসলে আমাদের দেখার ভুল।'

'তাহলে আপনি কী বলতে চান, আত্মা বলেও কিছু নেই?' বিনয়-বাবুর স্বরে বিস্ময় ঘনিয়ে ওঠে।

আমি বলি, 'ঠিক তাই। আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। তাইতো প্রেতাত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করছি।'

বিনয়বাবু বিস্ময়ে ঝেজে উঠলেন। তিনি বললেন, 'সে কি কথা! শাস্ত্র যে বলেন আত্মা অমর। পুরোন ছেঁড়া কাপড় ছেড়ে আমরা যেমন নতুন কাপড় পরি, আত্মাও তেমনি জীর্ণ দেহ ছেড়ে বারবার নতুন দেহ ধারণ করে।'

আমি নরম গলায় বলি, 'হাঁ। শাস্ত্র ঠিক কথাই বলেছেন। তবে এর সঠিক অর্থ না-বুঝে আমরা একটা মনগড়া ব্যাখ্যা করি। গণ্ডগোল এই জন্যে।'

'কী রকম?'

'এমন কিছু জটিল ব্যাপার না।' আমি বলি, 'এর ভেতর কী বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা রয়েছে সে সম্বন্ধে আমরা মাথা ঘামাই না। আবোল-তাবোল মানে করি। যাকে আমরা 'আত্মা' বলি, আসলে সেটা কী বস্তু জানতে হলে চেতন ও জড় সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা দরকার। যে পদার্থের মধ্যে চিন্তাশক্তি আছে, ইচ্ছামত গমনাগমন করতে পারে, স্মৃতি আছে, তাকে বলা হয় চেতন। আর যার মধ্যে এ-সব নেই তাকে বলে জড়। তাহলে দুটি জড় পদার্থের সংযোগে যে নতুন বস্তুর সৃষ্টি হয় সেটাও জড়। সে-রকম দুটি চেতন-পদার্থের সংযোগে চেতন-বস্তুরই সৃষ্টি হয়। এবার বলুন দেখি বিনয়বাবু, ভ্রূণটা কী? চেতন না জড়?'

বিনয়বাবু একটু ভেবে বললেন, 'চেতন।'

আমি সায় দিয়ে বলি, 'ঠিক বলেছেন। শুক্রকীট আর ডিম্বাণু, দুটোই হল চেতন পদার্থ। কারণ ওরা নিজে থেকে নড়তে চড়তে পারে। উভয়ের সংযোগে সৃষ্টি হলো ভ্রূণ। ভ্রূণের মধ্যে কোষ-বিভাজন করে ক্রমশঃ ওটার কলেবর বাড়তে থাকে। এরূপে হয় মানব-শিশুর জন্ম। শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের চৌকাঠ টপকে মানুষ শেষে উপস্থিত হয় বার্ধক্যের দরজায়। তারপর মৃত্যুর ছোবল। সোহাগের দেহটা চিরকালের জন্য অচল হয়ে যায়। এর মানে কী? না, যে চেতনশক্তি এতদিন দেহ-কোষের মধ্যে ক্রিয়া করছিল, সেটার ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে। এ-থেকে প্রমাণিত

হচ্ছে দেহটা জড়, যন্ত্রস্বরূপ। আর এই যন্ত্রকে যে পরিচালিত করে সেটা একটা শক্তি। এই শক্তি তবে গেল কোথায়?

'পদার্থ-বিজ্ঞান বলে, শক্তির ধ্বংস নেই। রূপান্তরিত হয়। বিদ্যুৎ চলচ্ছক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ট্রেন, পাখা ইত্যাদি চালায়। ট্রেন থেমে গেলে চলচ্ছক্তি আবার বিদ্যুৎ শক্তিতে ফিরে যায়। চেতন-শক্তি সম্বন্ধে এই একই কথা বলা চলে। অর্থাৎ চেতন-শক্তির ক্ষয় নেই। যেখানকার সেখানেই থেকে যায়।'

'কী রকম?'

আমি বলি, 'সমুদ্রে তরঙ্গের উৎপত্তি হয় কী করে? প্রথমে একটা বুদ্‌বুদ উঠে। ক্রমশঃ সেটা বড়ো হতে হতে শেষে বিরাট তরঙ্গের রূপ ধারণ করে। এই তরঙ্গ আবার সমুদ্রের বুকেই বিলীন হয়ে যায়। এ থেকে কী প্রমাণিত হচ্ছে? না, এ তরঙ্গের পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ তরঙ্গ সমুদ্র থেকে আলাদা, একথা ভাবা যায় না এবং সেটা সমুদ্র ছেড়ে কোথাও যায় না।

'আমাদের এই চেতন-শক্তি সম্বন্ধে একই কথা বলা চলে। চেতনশক্তি বুদ্‌বুদের মতো সমুদ্ররূপ মহাশক্তি হতে উৎপন্ন হয়ে শেষে এই মহাশক্তিতেই বিলীন হয়ে যায়। তাহলে এই চেতন শক্তির আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। এই মহাশক্তিকে শাস্ত্র বলেন, পরমাত্মা আর চেতনশক্তিকে, জীবাত্মা। জীবাত্মা, পরমাত্মা থেকে আলাদা একথা বলা যায় না। শক্তি একটাই। তা হচ্ছে মহাশক্তি। আর চেতনশক্তি তার তরঙ্গ-স্বরূপ।

'বিনয়বাবু, এবার আপনিই বিচার করে বলুন, আত্মা বলে কোন পৃথক সত্ত্বা আছে কী নেই? আর আত্মাই যদি না থাকে, প্রেতাত্মা আসবে কোথা থেকে?'

বউদি চোখ দুটো রগড়ে নিলেন। বোধ হয় একটু ঢুলুনি এসেছিল। সব কথা কানে ঢোকেনি। আমার দিকে ভ্রূজোড়া তুলে জিগোস করলেন, 'তাহলে মানুষ মরে যায় কোথায়?'

আমি বলি, 'এই তো বললাম। কোথাও যায় না। যেখানে আছে, সেখানেই থাকে। জড় দেহটা যে যে উপাদানে তৈরী, সেই সেই উপাদানে বিশ্লিষ্ট হয়। চেতন-শক্তি, মহাশক্তির মধ্যেই থেকে যায়। একজন্য শাস্ত্র বলেন, আত্মার জন্ম বা মৃত্যু নেই।'

'তাহলে পরলোক বলে কী কিছু নেই?'

'বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে পরলোক সম্বন্ধে রূপক করে যা বলা হয়েছে, আমি

বলি, তা স্রেফ ধাপ্পা।

'মানুষকে ভয় বা লোভ দেখানর জন্যই এসব গল্প ফাঁদা হয়েছে। এই মহাশক্তি বা পরমাত্মাই হল পরলোক। এছাড়া পরলোক বলে কোন স্থান থাকতে পারে না।'

'মহাশক্তি যে আছে, তা বুঝব কেমন করে?' বউদি জিগ্যেস করলেন।

আমি বলি, 'বিদ্যুৎ-শক্তি আছে সেটা বোঝেন তো? বৈদ্যুতিক তারে হাত দিলেই বোঝা যাবে। ঠিক তো? তাকে কী বলে? না অনুভূতি বা উপলব্ধি। মানুষও তেমনি উপলব্ধির দ্বারা মহাশক্তির অস্তিত্ব বুঝতে পাবে। ভারতীয় যোগ-সাধনা এমনই একটা সহজ সরল পন্থা, যার দ্বারা এই উপলব্ধি সম্ভব।'

'তাহলে ঠাকুর দেবতা, শিব-কালী, অবতার—এসব কী?'

আমি হাসতে হাসতে বলি, 'স্রেফ গাঁজা।'

বউদি থমকে যান।

আমি মৃদু হেসে বলি, 'হ্যাঁ বউদি, আমি ঠিকই বলেছি। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। আদিমযুগে মানুষ ছিল অসহায়। প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করবার ক্ষমতা ছিল না। প্রকৃতির কার্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও তারা করতে পারত না। বিদ্যুতের চমকানি দেখে, বজ্রপাত দেখে তারা ভয় পেত। ভাবল এ-সব বুঝি কোন অদৃশ্য দেবতার কাজ। পুজো দিলে বা আরাধনা করলে তাঁরা সন্তুষ্ট হবেন। এরূপে সৃষ্টি হল বজ্রের দেবতা ইন্দ্র। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে ইন্দ্র মানুষের কল্পনা-প্রসূত। তাঁর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই।'

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলাম :

'সূর্যি ঠাকুর চাঁদামামা এ্যাদ্দিন দেবতা বলে দিব্যি পুজো পেয়ে আসছিলেন। শাস্ত্রকাররাও স্তোত্র রচনা করলেন। এখন ত মানুষ বুঝতে পেরেছে, এগুলো জড়।

'কিছু সুযোগ-সন্ধানী স্বার্থান্বেষী লোক কুয়োর মধ্যে একটা পাথর ফেলে প্রচার করল, শিবঠাকুর উঠেছেন মাটি ফুঁড়ে। বাবা স্বপ্ন দিয়েছেন। কিছু দালাল তাঁর অলৌকিক কার্যের কাহিনী চারদিকে প্রচার শুরু করলেন। অমনি বাবার অন্ধভক্ত দলে দলে আসতে আরম্ভ করল। এরূপে হলো তীর্থস্থানের উৎপত্তি।

'বৈদিক যুগে সরস্বতী ছিল একটি নদীর নাম। নদীর উভয় পাশে জমি ছিল উর্বর। সেখানে প্রচুর ফসল হত। সম্পদের প্রাচুর্য-হেতু আর্যরা এই নদীকে দেবীরূপে কল্পনা করলেন। ঋগ্বেদে সরস্বতীকে ধন ও অন্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা হয়েছে। এখন তিনি বিদ্যা, বুদ্ধি, ত্যাগ ও বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে দিব্যি পুজো পাচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে পুজো করা হচ্ছে একটা হাঁসকে।

'সাঁওতাল উপজাতির কিছু অংশ হাঁসকে মাতৃদেবীরূপে পুজো করে। প্রাচীনকালে মিশরে কালো ষাঁড় হলো দেবতার পুত্র। এইরূপে প্রাচীনকালে কোটি কোটি দেবতার কল্পনা করা হয়েছে। আজকাল মানুষ ঐসব দেবদেবীকে ধুমধামের সঙ্গে পুজো করে অর্থ ও সময়ের অপচয় করছে। যেন উপরওয়ালাকে তোয়াজ করা হচ্ছে নিজেদের কার্য সিদ্ধির জন্যে।

'গঙ্গা হলো আর এক দেবী। কিছু গালগল্প জুড়ে দেওয়া হল। বিষ্ণুর পাদপদ্ম থেকে উৎপত্তি। কোথায় বিষ্ণু নামক এই দেবতা? তাঁকে কেউ কী কোনদিন দেখেছেন বলে সাক্ষ্য দিতে পারবেন? লোককে ধোঁকা দেবার জন্যে কিছু স্তোত্রও রচিত হল। এবার বুঝুন ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়িয়েছে? মল-মূত্র, নর্দমার জল, নানা কল-কারখানার রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি যে জলকে বিষাক্ত করে তুলেছে, সেই জল হল হিন্দুদের নিকট পরম পবিত্র। গঙ্গায় একটা ডুব দিলে সব পাপ নাকি দূর হয়ে যায়। কীরূপ অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা? এর জল কী আর পাঁচটা নদীর মতো নয়?

'আজকাল শনি, সন্তোষী-মা প্রভৃতি নতুন নতুন দেব-দেবী মিছিল করে মানুষের সামনে হাজির হয়েছে। আগে হিন্দুর দেবদেবীর সংখ্যা ছিল তেত্রিশ কোটি। এদের বংশবৃদ্ধি হয়ে এখন সত্তর কোটি ছুঁইছুঁই। একশ বছর পরে এই সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে চিন্তা করতে পারেন?

'এইসব অদৃশ্য অবাস্তব দেব-দেবী সৃষ্টির পেছনে মদত দিচ্ছেন মন্ত্রী, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা এবং সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত লোক। তাঁরা কী কিছুই বোঝেন না? তাঁদের আসল উদ্দেশ্য হল এভাবে দেশের লোককে কুসংস্কারের দিকে অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে প্রভুত্ব বিস্তার করা।

'এরূপে বিভিন্ন ঠাকুর-দেবতার সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে। এ-হল মানুষের মানসিক দুর্বলতার পরিচায়ক এবং লোক ঠকিয়ে পয়সা রোজগারের ফিকির।

'অবতার সম্বন্ধে ওই একই কথা। একজনকে অবতার বলে প্রচার করে কিছু দালাল-শ্রেণীর লোক। আর অবতার জাদুবিদ্যার দ্বারা অজ্ঞ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে ব্যবসা ভালরকম জমে উঠে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'আচ্ছা, ভারতের লোক অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তা না হয় মানলাম। কিন্তু সুশিক্ষিত সংস্কারমুক্ত ধনতান্ত্রিক দেশ থেকে যে 'হরেকৃষ্ণ সম্প্রদায়' ভারতে এসে নাচানাচি করছেন, এঁদের কী বলবেন?'

আমি হেসে বললাম, 'রাজনৈতিক কৌশল। ভারতবাসীকে অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও কুসংস্কারের দিকে ঠেলে দেবার বৈদেশিক চক্রান্ত। ভারত পিছিয়ে থাকবে, অনুন্নত থেকে যাবে আর ওরা বৈজ্ঞানিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ভারতের উপর প্রভুত্ব করবে।'

বউদি জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কী বলতে চান স্বর্গ নরক বলে কিছু নেই?'

আমি বলি, 'স্বর্গ বা নরক কল্পনা মাত্র। অবিশ্যি এ-রকম কল্পনা করবার দরকার ছিল। সাধারণতঃ বলা হয় পুণ্যকর্ম করলে স্বর্গবাস আর কুকার্য করলে নরকভোগ। এতে যে কোন কাজ হয়নি, সে-কথা বলছি না। লোকে স্বর্গসুখ লাভের আশায় এবং নরক-যন্ত্রণার ভয়ে কুকার্য থেকে বিরত হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, স্বর্গ বা নরক বলে কী কোন স্থান আছে? থাকলে কোথায়? এটাই ত জানতে চান আপনি?'

বউদি ঘাড় নেড়ে জানার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

আমি বলি, 'দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনের জন্যে আমরা একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেখি। যেমন একজন শৈশব বা কৈশোরে যুবতীকে যে চোখে দেখে, যৌবনে কিন্তু সে রকম দেখে না। আবার বার্ধক্যে সে অন্যরকম দেখে। এর কী কারণ? দৃষ্টিকোণের পরিবর্তের জন্য এরূপ হয়। তেমনি পৃথিবীর মানুষকে মানুষ, দেবতা বা দানব বলে মনে হয়। এই পৃথিবীকে এক সময় স্বর্গ অন্য সময় নরক বলে মনে হয়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে স্বর্গ-নরক বলে কিছু নেই। দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনের জন্যেই স্বর্গ ও নরক এরূপ জ্ঞান হয়।'

বিনয়বাবু এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলেন। তিনি বললেন, 'কিন্তু কর্মফল ত আছে।'

আমি আবার হাসি, 'আপনি কী বলতে চান বুঝতে পেরেছি। কর্মফল স্বীকার করলে আত্মার অস্তিত্ব ও পুনর্জন্ম পরোক্ষভাবে স্বীকার করতে হয়,

তাই না? মানুষ এমন কর্ম করল, তার সব ফল এজন্মে ভোগ হল না। বাকিটুকু ভোগ করবার জন্যে আবার তাকে জন্ম নিতে হয়।

'আগেই ত বলেছি, মৃত্যুর পর আত্মা বলে কিছুই থাকে না। তাহলে কর্মফল আসছে কী করে? তবে হ্যাঁ, কর্মফল আছে। যেমন একজন খুন করল। আইনের চোখে দণ্ডনীয় অপরাধ। ধরা পড়লে জেল জরিমানা বা ফাঁসি। এটা হলো কৃত কর্মের ফল। কিন্তু সে যদি ধরা না পড়ে? ভুপালে বিষাক্ত মিক গ্যাসে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর বলি হল। এর জন্যে দায়ী কে? কর্মফল? কারও ভুল? ত্রুটি? চক্রান্ত? পিতামাতা উভয়েই ডাইবেটিক। তাদের সন্তান-সন্ততির ঐ রোগ হল। দায়ী কে? কর্মফল? দারিদ্র্য. রোগ, মৃত্যু, অশিক্ষা ইত্যাদি কর্মফল বলে চালিয়ে দিলাম। সাধারণ লোক কর্মফল বলে মেনে নিয়ে নিজেকে হয়ত কিছুটা সান্ত্বনা দিতে পারে। এর জন্যে কী সামাজিক বৈষম্য ও সমাজ-ব্যবস্থা দায়ী নয়? এ থেকে বোঝা যাচ্ছে শোষণের সুবিধার জন্যে সরল-প্রকৃতি মানুষের মধ্যে নিয়তি, দৈব, কপাল, ভাগ্য, কর্মফল ইত্যাদি সম্বন্ধে বড়ো বড়ো বুলি আউড়ে তাঁদের ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে।'

বিনয়বাবু বললেন, 'এসব কথা ত আগে ভাবিনি। কিন্তু একটা বিষয়ে খটকা লাগছে।'

'কী বলুন?'

বিনয়বাবু বলেন, 'অবতার-সাধু-সন্ন্যাসী, এনারা ত আজেবাজে কথা বলবেন না। তাঁরা ত স্বচক্ষে মা কালীকে দেখেছেন। প্রেতাত্মার অস্তিত্ব ও কর্মফল স্বীকার করেছেন। এঁনাদের কথা ত উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

আমি হেসে বলি, 'সমাজে বুদ্ধিমান কৌশলী কিছু লোক আছেন। তাঁরা জাদুবিদ্যা দেখিয়ে নিজেদের অলৌকিক বা ঐশ্বরিক শক্তির পরিচয় দেন। সরল বিশ্বাসী ভক্তরা তখন অবতার, স্বামিজী, বাবা, বাবাজি ইত্যাদি বলে কথিত বুজরুকের চারদিকে মশামাছির মতো ভ্যানভ্যান করে। ভক্তবৃন্দ প্রণামী বাবদ বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করে। অবিশ্যি ভক্তরা যে একেবারে নিঃস্বার্থভাবে দান করে, তা না। এদেরও স্বার্থ আছে। যেমন পরীক্ষায় পাশ করা, চাকরী পাওয়া, ভোটে জেতা, মামলা-মকর্দমায় জেতা ইত্যাদি। এসব বাবাজিরা নিজেদের সৎ প্রমাণ করবার জন্য হাসপাতাল, মঠ, আশ্রম, মন্দির প্রভৃতি তৈরী করে। সমাজে আর একশ্রেণীর লোক আছেন, তাঁরা সত্যিকারের সরলপ্রকৃতি ও ধর্মপ্রাণ। তাঁরা দীর্ঘকাল

ধরে ঠাকুর-দেবতার মূর্তি পুজো ও ধ্যান করে নিজেদের সিদ্ধপুরুষ বলে প্রচার করেন। অনেক সময় বলেন যে তাঁরা জিব-বের করা মা-কালী বা বাঁশী-হাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতাকে দেখেছেন। তাঁদের বাণী নিজেদের কানে শুনেছেন ইত্যাদি। এ-রকম দর্শন বা শ্রবণকে বলা হয় মতিভ্রম বা হ্যালুশিনেশান।'

বউদি জিগ্যেস করলেন, 'মতিভ্রম কেন হয়?'

আমি বলি, 'মস্তিষ্কে অসংখ্য স্নায়ুকোষ আছে। চিন্তা বা মন হল এসব কোষের রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। দীর্ঘকাল কোন দেবদেবীর কাল্পনিক মূর্তি গভীরভাবে চিন্তা বা ধ্যান করলে স্নায়ুকোষে তড়িৎ রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয়। এর ফলে ভ্রান্তদর্শন (Visual Hallucination) বা ভ্রান্তশ্রবণ (Auditory Hallucination) ইত্যাদি হয়।

'গাঁজা চরস প্রভৃতি নেশার বস্তুতে অভ্যস্ত হলেও মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে এরকম অস্বাভাবিক ক্রিয়া হয়। মস্তিষ্কের ক্রিয়ার তড়িৎ বিশ্লেষণ (ই, ই, জি) করে বৈজ্ঞানিকরা তা প্রমাণ করেছেন।'

'কথাগুলো শুনতে মন্দ লাগছে না। তবে একটু ঝাঁঝালো।' বিনয়-বাবু কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে নিলেন। জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, বলতে পারেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলছে কী করে?'

আমি বলি, 'আজ্ঞে, এটা কোন অজ্ঞাত দেবতার নির্দেশে চলছে না। চলছে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের নিজস্ব নিয়মে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ছ'টা ঋতু চক্রাকারে ঘুরছে। জল থেকে বাষ্প, বাষ্প থেকে মেঘের সৃষ্টি। মেঘ আবার বৃষ্টির আকারে মাটিতে পড়ছে। এসব ঘটনা প্রকৃতির নিয়মের অধীন। কোন অদৃশ্য দেবতার হাত এতে নেই।'

দেওয়াল-ঘড়ি জানিয়ে দিল রাত অনেক হয়েছে।

আমি বলি, 'উঠা যাক। নইলে রাত কাবার হয়ে যাবে।'

বউদি বাচ্চাটাকে কাছে নিয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়লেন। আমি ও বিনয়বাবু পাশের ঘরে।

পরের দিন সকালে ড্রইং রুমে টেবিলের ধারে বসে আছি। বিনয়বাবু খবরের কাগজের পাতা উল্টাচ্ছেন। বউদি আমাদের সামনে মুখোমুখি। কেষ্ট চা ও বিস্কুট দিয়ে চলে গেল। আমি আধখানা বিস্কুট শেষ করে সবে চায়ে চুমুক দিয়েছি, এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে কেষ্ট দৌড়ে এল।

মুখ-চোখে আতঙ্কের ছাপ।

'কী হল, কেষ্ট?' আমি জিগোস করি।

'গোলমাল হচ্ছে, ডাক্তারখানার সামনে।' কেষ্ট তোতলাতে লাগল। ভয় পেয়েছে।

'কিসের গোলমাল?'

'গেরামের জনা-দশেক ছোকরা দরজায় ধুমধাম ধাক্কা মারছে।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'কাল রাতে বিমলবাবুকে মেরে ফেলেছে।' কেষ্ট বিবর্ণ-মুখে মিন-মিন করে বলল।

'কে মারল?' আমার বিস্ময় বেড়ে যায়।

'মামদোভূত।'

'মামদোভূত! কে বলল?' আমি বিরক্ত।

'হ্যাঁ বাবু, তাইতো সবাই বলছে।'

'হুঁ। ভূতে মেরেছে! যত্তসব—। তা এখানে হুজ্জত কেন?' আমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়ি।

'তা ত জানি না বাবু।'

'চল্ ত দেখি।' এই বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম। বিনয়বাবু ও বউদি আমার পিছে পিছে এলেন।

এসে দেখি স্থানীয় নামকরা এক মাস্তান ও তার সাঙ্গোপাঙ্গ ভিড় করে দাঁড়িয়ে। আমায় দেখে ছোঁড়াগুলো একটু চুপ করল। তবে একজন বুক বাজিয়ে চিৎকার করে বলল, 'এ খুনের বদ্‌লা চাই।' মাস্তান ছেলেটি এগিয়ে এসে বলল, 'গত রাতে বিমলবাবুকে গলা টিপে খুন করেছে মামদো-ভূতে।' এক ছোকরা অশোভন ভঙ্গি করল।

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, 'বিমলবাবু হার্টের রোগী। অনেকদিন ধরে ভুগছিলেন। আমিই ত এ্যাদ্দিন তাঁকে দেখে আসছিলাম। হার্টফেল করে মারা গেছেন। এ তো স্বাভাবিক মৃত্যু। ভূতে মেরে ফেলেছে! কে দেখেছে?'

ছেলেগুলো ঘাবড়ে গেল। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঝটপট সরে পড়ল। বুঝলাম এই মাস্তানদের পেছনে কাজ করছে বিষ্টুবাবুর উসকানি।

আমরা ড্রইংরুমে ফিরে এলাম। চা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তাই কেষ্ট আবার গরম চা দিয়ে গেল। বিনয়বাবু বলে উঠলেন, 'আমরা বরং

বাচ্চাটাকে নিয়ে এখনই চলে যাই।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'না। তা হয় না। এরকম ভীরুর মতো পালিয়ে গেলে, ওদের অভিযোগ স্বীকার করে নেওয়া হবে। কুসংস্কারের কাছে কিছুতেই মাথা নিচু করা যায় না। দেখা যাক, জল কদ্দূর গড়ায়।'

আমরা চা খেয়ে বাইরে বারান্দায় এলাম। এমন সময় গেরামের হাবুল সর্দার দৌড়ে এল। জিগ্যেস করি, 'কী খবর রে?'

'ভাল না ডাক্তারবাবু।' হাবুলের মুখখানা ফ্যাকাশে। পুরু ঠোঁট জোড়া থরথর করে কাঁপছে।

'কী? কার অসুখ?'

মুখখানা কাঁচুমাচু করে হাবুল বলল, 'অসুখ না, ডাক্তারবাবু। আমার খড়ের গাদা কাল রাতে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। অনেক টাকা ক্ষেতি হয়েছে।'

'তা কে আগুন দিল?' আমি বিস্মিত কণ্ঠে জিগ্যেস করি।

'আজ্ঞে সবাই বলছে, মামদোভূতে।'

আমি একটু ধমক দিয়ে জিগ্যেস করি, 'কে দেখেছে?'

সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কপালে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম। বড়ো বড়ো চোখ দুটো জলে ভাসা।

আমি তখন নরম স্বরে বললাম, 'খেসারত চাস তো? ঠিক আছে। কে সাক্ষী আছে, তাকে ডেকে নিয়ে আয়।' সে অসহায়ের মতো আমার দিকে তাকিয়ে চলে গেল।

এর পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে এলেন বিষ্টুবাবু স্বয়ং। সারামুখে উত্তেজনা। কপালে ঘাম চিন চিন করছে। বিনা ভূমিকায় তিনি বললেন, 'এবার কী হবে? তখন-না বলেছিলাম 'অমঙ্গল' ছেলেটাকে বিদেয় করতে?'

'কেন? কী হয়েছে?' আমি উদ্বিগ্ন হই।

ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, 'লোহার আলমারি থেকে গত রাতে স্ত্রীর সোনার হার চুরি গেছে।'

রাগে মাথার রক্ত গরম হয়ে গেল। তবুও নিজেকে সংযত করে মেকি হেসে বললাম, 'নিশ্চয়ই এ চোরের কাজ। থানায় ডায়ারি করুন। আমি কী করতে পারি বলুন?'

বিষ্টুবাবু ঠোঁট উল্টে জবাব দিলেন, 'হুঁ। চোরে! চোরের বাবার ক্ষমতা কী? চাবি রইল আমার বালিশের নিচে। আর চোরে চুরি করল, বললেই আমি বিশ্বাস করব?'

একটু থেমে তিনি চড়া গলায় বলতে শুরু করলেন, 'এ হলো ভূতের কাজ, বুঝলেন ? আর এর জন্যে দায়ী আপনি। বিষ্টুদাসকে চেনন না…।' তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেলেন।

বিনয়বাবু ভীত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ব্যাপারটা মোটেই সুবিধের না। বরং আমরা…'

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম, 'কুসংস্কারকে অত সহজে মেনে নেবেন না। এ মানুষভূতের কাজ। দেখাই যাক, শেষ পর্যন্ত কী ঘটে। একটু ধৈর্য ধরুন।'

জামা-কাপড় ছেড়ে প্যান্ট পরলাম। গায়ে হাওয়াই সার্ট চড়িয়ে নিলাম। পায়ে মোজা প'রে বুটজোড়া গলিয়ে দিলাম। চেম্বারে যাবার উপক্রম করছি, এমন সময় বিষ্টুবাবুর চাকর হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এল।

'কী রে ? তোর আবার কী ?'

সে আমতা আমতা করে বলল, 'বাবু আপনাকে ডাকছেন। গিন্নীমার ভর হয়েছে।'

আমি বিনয়বাবুকে সঙ্গে নিয়ে বিষ্টুবাবুর বাড়ি হাজির হলাম। দেখি, কমলাক্ষীর চোখমুখ অস্বাভাবিক। সে জলজলে চোখে আমায় দেখে নিল। তারপর খোনা সুরে বলতে লাগল, 'আমি মামদোভূত। হারটা ডাক্তারবাবুর চেম্বারে রেখে এসেছি। টেবিলের নিচে।' একই কথা বার-তিনেক বলে চিৎ হয়ে পড়ে গেল।

বিষ্টুবাবু আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। ঝাঁঝালো স্বরে জিগ্যেস করলেন, 'এবার কী বলবেন, ডাক্তারবাবু ?'

'ঠিক আছে। সত্যতা যাচাই করে দেখা যাক।' আমি শান্ত স্বরে জবাব দিলাম।

চেম্বারে টেবিলের নিচে একটা কাগজের মোড়ক খুঁজে পেলাম। মোড়ক খুলতেই অবাক বিস্ময়ে দেখি, একটা সোনার হার। লকেটে 'কমলাক্ষী' নাম খোদাই করা।

বিষ্টুবাবু উত্তেজিত হয়ে আমার দিকে তাকালেন। রুক্ষকণ্ঠে বললেন, 'এরপরও কী আপনি বলবেন, 'মানসিক রোগ ?'

আমি জোর গলায় বললাম, 'হ্যাঁ ! এখনও বলছি। এটা প্রমাণ করে দিতে পারি।'

'বেশ। কী করতে চান বলুন ?' বিষ্টুবাবুর গলায় দাম্ভিকতার সুর।

'রোগিনীকে একবার পরীক্ষা করব।' আমি শান্তভাবে বলি।

'বেশ তো, ভাল কথা। অনেক ওঝা দেখান হল। আপনি দেখবেন। দেখুন। আপত্তি কী?' বিষ্টুবাবু একটু গরম গলায় বললেন।

কমলাক্ষীকে একটা ইজি-চেয়ারে বসান হল। ঘরে বিষ্টুবাবু ছাড়া অন্য কাউকে ঢুকতে দিলাম না। দরজা বন্ধ করে দিলাম। কমলাক্ষীকে মৃদু সম্মোহন করে দ্রুত প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম।

সে জানাল, 'রাত্তিরে খাবারের সঙ্গে সে স্বামীকে ঘুমের বড়ি-গুঁড়ো দিত। স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে সে-ই এইসব কাজ করত। বাড়ি বাড়ি নোংরা সে-ই ফেলত। এ-কাজে সাহায্য করত তাদের বাড়ির ঝি। স্কুলে সে আরবী পড়েছিল। এখনও কিছু কিছু মনে আছে। বিমলবাবুর মৃত্যু কী করে হল, সে জানে না। খড়ের গাদায় আগুন সেই দিয়েছে। আলমারি খুলে সেই হার চুরি করেছে। ডাক্তারখানায় তাদের ঝি ছুঁড়ে ফেলেছে খোলা জানলা দিয়ে। ভূতের ব্যাপার সত্যি না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এ-সব কাজ সে কেন করতে গেল?'

কমলাক্ষী প্রশ্ন শুনে যেন গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে যায়। আমি আবার একই প্রশ্ন করলাম। সে অস্পষ্ট স্বরে জবাব দিল:

'আপনি যে বাচ্চাটাকে শ্মশান থেকে এনেছেন, তাকে একদিন দেখতে গেছিলাম। দেখে আমার খুব ভয় হল। আমি তখন আইবুড়ো। নিজের ভুলের জন্যে আমার এ-রকম একটা ঠোঁট-কাটা ছেলে হয়। হাত থেকে পড়ে গিয়ে তারও কপাল কেটে গেছিল। তাকে শ্মশানে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ভাবলাম সেই ছেলেই বুঝি ফিরে এসেছে। তবে ত জানাজানি হয়ে যাবে। লজ্জার ব্যাপার। তাই ছেলেটাকে তাড়াবার জন্যে…।'

বিষ্টুবাবু বিষণ্ণমুখে এতক্ষণ শুনছিলেন। এবার তিনি যেন আঁৎকে উঠলেন।

'কী সর্বনাশ!'

*

বিকেলের দিকে বিনয়বাবু ও বউদির সঙ্গে চা খাচ্ছিলাম। বউদি জিগেস করলেন, 'বাচ্চাটাকে তাড়াবার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম। কিন্তু অন্যভাবেও ত একাজ করা যেত। কেন এই নোংরামি?'

আমি বলি, 'এই বাচ্চাটাকে দেখে কমলাক্ষীর নিজের বাচ্চাটার কথা মনে পড়ে যায়। হয়ত হুবহু মিল ছিল। যেমন করে হোক তার একটা

ভ্রমাত্মক অনুভূতি (Illusion) হয়। সে ভয় পেয়ে গেল। নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্যে সে তখন নানা চিন্তা-ভাবনা শুরু করল। এর ফলে তার অবচেতন-মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি। ক্রমে সে মানসিক রোগে আক্রান্ত হল।

'ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা (Delusion) যা প্রায় প্রত্যেক লোকেরই আছে, নিশ্চয়ই তারও ছিল। ভূতের আবির্ভাব ঘটানো তার অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থার পরিচায়ক। এর দ্বারা যে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে চেয়েছিল নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে।'

বউদি ও বিনয়বাবু যাবার জন্যে তৈরী হলেন। বাচ্ছাটাকে নতুন রঙচঙে পোশাক পরালেন। টানাটানা চোখে কাজল। কপালে ছোট টিপ। বাচ্ছাটার মুখে হাসি। ভারি সুন্দর।

বিদায়কালে বললাম, 'বউদি! আমার একটা আবেদন আছে।'

'বলুন?'

'ছেলেটির নাম 'সুমঙ্গল' রাখলে খুশি হব।'

উভয়ে ঘাড় নাড়লেন। চলে গেলেন। আমি শূন্য চোখে তাকিয়ে রইলাম। আমার স্মৃতির অন্ধকার-ঘরে ছেলেটি পড়ে রইল ছবি হয়ে।

দুই
অগ্রদূত

শীতকালের রাত্তির। আচমকা ঘুমটা গেল ভেঙে টেলিফোনের শব্দে। ক্রিং ক্রিং শব্দ কখন্ থেকে বেজে যাচ্ছে কে জানে? ধড়মড় করে উঠে ফোনটা ধরলাম।

'হ্যালো, হ্যালো।' একটা পুরুষ গলার স্বর ভেসে এল, 'হ্যালো। ডাক্তার সায়েব আছেন?'

'হ্যাঁ, বলছি।'

'নমস্কার। আমি সরোজ সরকার। মগরা থেকে বলছি।'

'নমস্কার। কী খবর?'

সরোজবাবু ধরা গলায় বললেন, 'ভাইপোর জ্বর। ভুল বকছে। একবার আসতে পারবেন?'

ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি। চোখ দুটো রগড়ে নিলাম। একটু ইতস্তত: করে বলি, 'আচ্ছা আসছি।' রেডিয়াম ডায়েল-লাগানো হাত-ঘড়িতে তখন রাত্রি দেড়টা।

সরোজবাবুর বাড়ির সামনে মোটর থামে। পাকা রাস্তার ধারে সাজানো-গোছানো বাড়ি। গঠন-পেটন আধুনিক ঢং-এর। দোতলা। বাড়ির সামনে মানুষ-সমান উঁচু কাঁটাতারের বেড়া-ঘেড়া বাগান। নানা জাতের ফুলের মেলা। বাগানে ঢুকবার মুখে সুন্দর করে রঙ-করা গ্রিল গেট। ছিটকিনি আটকানো। গেট থেকে বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত ইট দিয়ে বাঁধানো সোজা উঁচু রাস্তা। রাস্তার দুপাশে ইলেকট্রিকের খুঁটিতে ঝুলানো গোটা-কতক টিউব লাইট। আলোর ঝলমলানিতে সমস্ত বাগানে যেন রহস্যের ছায়া।

গাড়ি থেকে নেমে গেটের দিকে এগোচ্ছি। একটা লোক চকিতে গেট খুলে ছিটকে সরে দাঁড়াল। তাকে দেখে আমি কৌতূহল ও বিস্ময়বোধ করলাম। একেই ত এতদিন খুঁজছি। তাহলে এ-বাড়ির চাকর-বাকর হবে। —এই মনে করে এগিয়ে গেলাম।

সরোজবাবু আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর

চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। হাত তুলে নমস্কার করে আমাকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

খাটের উপর লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে ভাস্কর। সরোজবাবুর আদরের ভাইপো। বয়েস আর কত? বড়োজোর বারো কি তেরো। মাথার কাছে বসে আছেন ভাস্করের মা ও সরোজবাবুর স্ত্রী। খাটের ধার ঘেঁসে হাতলওলা কাঠের চেয়ারে বসেছিলেন সরোজবাবুর গৃহচিকিৎসক, ডাঃ মৃণালকান্তি মজুমদার। আমাকে দেখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি নমস্কার করে আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলেন।

'ভাস্কর ভালই ছিল। আজ সন্ধ্যের সময় মাস্টারের কাছে পড়াশোনা করেছে। রাতের খাবার খেয়েছে দশটায়। বই-পাগল ছেলে। বিছানায় শুয়ে পড়তে-পড়তে কখন্ ঘুমিয়ে গেছে। ওর মা পাশেই শুয়েছিলেন। মাঝরাতে হঠাৎ চোখ কপালে তুলে বিকট চিৎকার। তারপর ভুল বকতে আরম্ভ করে। আমি এসে দেখি, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। ১০৪ ডিগ্রি। এই একটু আগে চুপ করেছে।'

আমি রোগীকে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড। ঘাম হচ্ছে। জামাটা ভিজে জবজবে। দেহের তাপ স্বাভাবিক। রোগের কোন লক্ষণ খুঁজে পেলাম না।

আমি বলি, 'রোগীর অবস্থা ভাল। এখনই কোন ওষুধ দরকার নেই।'

রোগ না থাকলেও অনেক সময় মন সন্তোষের জন্যে কিছু মামুলি ওষুধ লিখে দিতে হয়। তাই ব্যবস্থাপত্র লিখে ডাঃ মজুমদারকে কিছু নির্দেশ দিলাম।

ভাস্কর জেগেই ছিল। সে নিজে থেকে উঠে বসল। আমি তাকে এক কাপ হরলিক্স দিতে বললাম।

সরোজবাবুর স্ত্রী আমাকে ও ডাঃ মজুমদারকে কফি দিলেন।

এক চুমুক কফি খেয়ে গলা খাঁকারি দিলাম। সরোজবাবুকে জিগ্যেস করলাম, 'আচ্ছা ঐ নতুন চাকরটা জোগাড় করলেন কোত্থেকে?'

সরোজবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। 'নতুন চাকর! চাকর কোথায় দেখলেন ডাক্তারবাবু?'

আমি চমকে উঠে বলি, 'কেন? এক অদ্ভুত চেহারার লোক গেটটা খুলে দিল। ভাবলাম, আপনাদের বাড়ির চাকর। লোকটাকে এর আগে দুবার দেখেছি। তবে পরিচয় নেবার সুযোগ পাইনি।'

সরোজবাবুর স্ত্রী বাধা দিয়ে বললেন 'তাজ্জব ব্যাপার। রামু ছাড়া বাইরের লোক কেউ ত নেই। সে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। তাকে ত আপনি অনেকবার দেখেছেন।'

তাই তো। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, 'চেনা লোক। চিনতে ত ভুল হবে না।'

কাপে অল্প কফি ছিল। এক ঢোঁকে গিলে ফেললাম। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝছি না। একবার খোঁজ করে দেখলে হতো।'

সরোজবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'ছিঁচকে চোর। সে কী আর এতক্ষণ আছে? বলছেন যখন, চলুন দেখি।'

সবাই মিলে এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করলাম। লোকটা যে কোথায় গা-ঢাকা দিল বুঝতে পারলাম না। ব্যাপারটা আমার কাছে অস্বাভাবিক বোধ হল। কোথায় যেন গণ্ডগোল হচ্ছে। গা শির শির করে উঠল। একটা অজানা আশঙ্কা বুকের ভেতর। আমি সরোজবাবুকে বললাম, 'চলুন ফিরে যাই। আপনাকে কিছু বলার আছে।'

আমরা সকলে ফিরে এসে বাইরের ঘরে বসলাম। আমি বলতে শুরু করলাম :

তখন বোশেখ মাস। চুঁচড়ো-তারকেশ্বর রোড ধরে মোটরে ফিরছি। দিল্লি রোডের কাছাকাছি এসে পড়েছি। দেখি, পশ্চিম আকাশে একখণ্ড কালো মেঘ। চারদিকে থমথমে ভাব। মনে হল একটা-কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তাই-ই। গাড়ির পিছনের একটা চাকা বিকট শব্দে পাংচার হল। চালক পরেশ গাড়ি থামিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল, সেই সঙ্গে আমিও।

এমন সময় পিছন পানে তাকিয়ে দেখি, পুরোন মডেলের একটা অষ্টিন ধুঁকতে ধুঁকতে আসছে। কাছে এসে চালক জোরে হর্ণ বাজাল। আমরা একটু সরে দাঁড়ালাম। গাড়িটা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

গাড়ির রঙ চাঁচা-ছোলা। দেখতে ঠিক মরা-কাছিমের খোলার মতো। ভেতরে জনা-পাঁচেক ছোকরা। ছেলেগুলো হৈ হৈ করে চেঁচিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একজন বুড়ো-আঙুল দেখিয়ে বিদ্রূপের গলায় বলে উঠল, 'অ্যা—ম—বা—সা—ডা-র।' অপর একজন মুখ বাড়িয়ে বলল, 'ঠেলুন দাদা! ঠেলুন।'

ওরা চলে যায়।

স্ক্রু খুলতে গিয়ে আর এক বিপত্তি। পরেশ মাথা নেড়ে বলল, 'একটা খোলা যাচ্ছে না। এঁটে গেছে।'

আমি হতাশ স্বরে বলি, 'এখন উপায়?'

পরেশ মাথা চুলকে বলল 'প্যাঁচ কাটতে হবে। ছেনি চাই।'

এ-যে দেখছি, গোদের ওপর বিষফোঁড়া। 'গাড়িতে ছেনি নেই?'

পরেশ ঢোক গিলে বলল, 'না তো।'

বলতে না বলতেই আচমকা দিগন্ত কাঁপিয়ে সোঁ সোঁ শব্দে ঝড় উঠল। ধুলো-বালির ঝাপটা লেগে চোখ দুটো করকর করতে লাগল। দপ করে নিবে গেল দিনের আলো। ঘন ঘন বিদ্যুতের চমকানি আর বাজপড়ার কড়কড় শব্দ। বেগতিক দেখে দুজনে গাড়িতে উঠে বসলাম। কাঁচ তুলে দিলাম। আশেপাশে গাছের ডালপালা ভেঙে পড়ার মড়মড় শব্দ শুনতে পেলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় ঝেঁপে বৃষ্টি। ঘোলাটে কাঁচের ভেতর দিয়ে বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

আস্তে আস্তে থেমে এলো ঝড়বৃষ্টি। বদলে গেল প্রকৃতির রূপ। পরিষ্কার হয়ে উঠল আকাশ।

পরেশকে বললাম, 'আর একবার চেষ্টা করো। আমি ততক্ষণ এদিক-ওদিক দেখি ছেনি পাওয়া যায় কিনা।'

এগিয়ে গেলাম অদূরে মুদির দোকানে। দোকানদারের কাছে ছেনির খোঁজ করায় সে ঝাঁঝি মেরে বলল, 'এটা মুদির দোকান। কামারশালায় খোঁজ করুন।'

জিগ্যেস করলাম, 'এখানে কামারশালা কোথায়?'

'দু-পা এগিয়ে দেখুন-না, মশাই।' সে বিরক্ত।

কোথায় খুঁজব? বরং পরেশকে পাঠিয়ে দিই। এই ভেবে ফিরে আসছি।

দূর থেকে লক্ষ্য করি, ষণ্ডামার্কা একটা লোকের সঙ্গে পরেশ কী কথা বলছে। আমি কাছাকাছি আসতে সে আমার দিকে একবার চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। মনে হল চোখ নয়, যেন আগুনের গোলা। সে দিল্লি রোডের দিকে হনহন করে চলে গেল।

বয়েস আন্দাজ চল্লিশের কোঠায়। দশাসই চেহারা। চওড়া কপাল। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুল। মুখ ছুঁচলো। থ্যাবড়া নাকের নিচে

ইয়া লম্বা গোঁফ। কালো। দুপাশে পাকানো। এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখ দুটো কাতলা মাছের মতো ড্যাবাড্যাবা, কিন্তু ভীষণ। বুক বেশ উঁচু ও চওড়া। গায়ের রঙ মিশকালো। হাত-পায়ের পেশী ইস্পাতের মতো শক্ত। গায়ে লালচে ফতুয়া। পরণে লাল রঙে ছোপানো ধুতি। গোড়ালি থেকে বেশ খানিকটা তোলা। খালি পা। যেটুকু দেখেছি তাতেই চেহারাটা মনে গাঁথা হয়ে গেছে।

পরেশকে শুধাই, 'লোকটা কে রে?'

পরেশ সহজভাবে জবাব দিল, 'চিনি না। ওকে দু-টাকা বকশিস দিতে গেলাম, নিল না।'

'বকশিস কেন?'

'ঐ তো স্ক্রুটা খুলে দিল।'

'খুব তাড়াতাড়ি প্যাঁচ কেটেছে দেখছি।'

'না। কাটার দরকার হয়নি। আঙুল দিয়ে ঘুরিয়েই খুলে দিন।'

আমি আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করি, 'বল কী! যন্ত্র ছাড়াই—?'

'হ্যাঁ। মন্তর-টন্তর জানে বোধ হয়।'

আমি মৃদু ধমক দিয়ে বলি, 'মন্তর-টন্তর আবার কি। লোকটা কায়দা জানে। তুমি সেটা জানো না। নাও, চাকা লাগিয়ে চলো।'

গাড়ি ছুটল হু হু করে। রাস্তা ফাঁকা। জানলা ঘেঁষে বসে আছি। কাঁচ নামিয়ে দিয়েছি। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া। বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। রাস্তার ধারে বড় বড় গাছ আসছে আর ছুটে চলে যাচ্ছে। আকাশে ঝকঝকে রোদ। উজ্জ্বল নীল মেঘ। দিল্লি রোড পেরিয়ে চলে এসেছি। হঠাৎ নজরে পড়ল এক করুণ দৃশ্য।

প্রকাণ্ড এক আমগাছ উপড়ে রাস্তার উপর আছড়ে পড়েছে। বহু লোক জড়ো হয়ে জটলা করছে। চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। গুটি কয়েক লোক কোমরে গামছা জড়িয়ে কাটারি-কুড়ুল দিয়ে ডাল কাটছে, রাস্তা পরিষ্কারের জন্যে। একটা অষ্টিন গাড়ি চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে রাস্তার ধারে খাদের উপর হেলে পড়েছে। গাড়ি দেখেই চিনতে পারলাম। ইতস্ততঃ চাপ চাপ জমাট রক্ত। প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনলাম, গাড়িতে জনা-পাঁচেক উঠতি-বয়েসের ছোকরা ছিল। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদের স্থানীয় হাসপাতালে পাঠান হয়েছে।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আনন্দময়ী প্রকৃতির মধ্যে সংহারিণী রূপ

দেখে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। ভাবতে লাগলাম, আনন্দের মধ্যে শোক-দুঃখের বীজ লুকিয়ে থাকে। ধ্বংসই সৃষ্টির সঙ্কল্প। ঝড় নিমিত্ত মাত্র। ভাগ্যিস চাকাটা পাংচার হয়েছিল। ধূমকেতুর মতো এক অজানা বন্ধুর আকস্মিক আবির্ভাব, তার অযাচিত সাহায্য এবং দ্রুত অন্তর্ধান—এগুলি কিসের ইঙ্গিত, বুঝতে পারলাম না।

*

একদিন সকালের দিকে বেরিয়েছি। কলকাতায় যাব জরুরি কাজে। চুঁচড়ো ইস্টিশনের কাছাকাছি এসেছি, নজরে পড়ল প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো লোক্যাল ট্রেন। দিলাম দৌড়। ইস্টিশনের সিঁড়ি ভেঙে উঠতে একটু দেরি হয়ে গেল। শেষ-বেশ যখন প্ল্যাটফর্মে পৌঁছিলাম, তখন বাঁশি বেজে গেছে। এখনি চলে যাবে নাগালের বাইরে।

লাফিয়ে উঠতে গেলাম। বাদ সাধল দরজা অবরোধ করে দাঁড়ানো একটা লোক। চেঁচিয়ে বললাম, 'সরুন মশাই, সরুন।' সে একচুলও নড়ল না।

লোকটার দিকে কটমট করে তাকালাম। বিস্ময়ে আমার তাক লেগে গেল।

সেই অজানা বন্ধু! মুখ, চোখ, কাপড-জামা, সবই এক। হাতে সেই মার্কামারা ব্যাগ। ট্রেন চলে গেল ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

পরের ট্রেনে হাওড়া যাচ্ছি। বৈদ্যবাটি ইস্টিশনে এসে গাড়ি গেল থেমে। ছাড়বার আর নাম নেই। সিগ্ন্যাল না গাড়ি, কোন্‌টা খারাপ বুঝতে পারলাম না।

ততক্ষণে দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। আগের লোক্যাল ট্রেনটি হাওড়া ইস্টিশনের কাছে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। আপ্ ও ডাউন সব গাড়ি বাতিল। শুনে বুকটা ধড়াস করে উঠল।

পরের দিন কাগজে দেখলাম, কারসেডের কাছে একটা দাঁড়ানো গাড়ির পিছনে-আসা ব্রেক ফেল-করা গাড়ি ধাক্কা মেরেছে। বহুলোক হতাহত। ছবি দেখে শিউরে উঠলাম। আমার যে কী শোচনীয় অবস্থা হতো, চিন্তা করে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম সেই অজানা বন্ধুকে।

এরপর এখানে-ওখানে যেখানেই গেছি, সেই অজানা বন্ধুকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছি। আজ তাকেই গেট খুলতে দেখলাম।'

ঘরসুদ্ধ লোক হাঁ করে আমার কথাগুলো যেন গিলছিল। সরোজবাবু

খানিক গুম হয়ে বসে রইলেন। নাকের ডগা থেকে গান্ধী-চশমাটা খুলে ফেললেন। মুখ ফ্যাকাসে। আপন মনে বলে উঠলেন, 'লোকটা কালা-পাহাড়! মৃত্যুর সঙ্গে যোগ আছে।'

আমি অন্যমনস্কভাবে বললাম, 'তা ঠিক নয়। তবে লোকটা সন্দেহ-জনক।'

রোগীকে আর-একবার পরীক্ষা করে ডাঃ মজুমদারকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে আমি বিদায় নিলাম।

*

বাড়িতে পৌঁছে আমার চক্ষু চড়কগাছ। গ্যারেজ-ঘর খোলা। মজবুত তালা দুটো ভাঙা অবস্থায় পড়ে। ভাগ্যিস কল-এ গিয়েছিলাম গাড়ি নিয়ে! নইলে গাড়িটা যেত।

ঘরে ঢুকে জামা-প্যান্ট ছাড়ছি। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে নিলাম। ডাঃ মজুমদার। তিনি জানালেন: 'হেঁচকি উঠছে। আবার জ্বর দেখা দিয়েছে। ওষুধে বাগ মানছে না। শিগগির আসুন।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। হঠাৎ আলো গেল নিবে। ঝুপ করে নেমে এলো অন্ধকার গোটা পাড়া জুড়ে।

তিন

স্বপ্নদর্শন

আজকে এগিয়ে-যাবার যুগে এই কাহিনী অনেকের নিকট অ-সাধারণ বলেই মনে হবে। তাই হয়ত আজগুবি বলে উড়িয়ে দেবেন। আমারও নিকট প্রথমে যে এরকম মনে হয়নি তা নয়। তবে এই ঘটনার মধ্যে এক আশ্চর্য আবিষ্কারের আনন্দ আছে, সেটা জানিয়ে রাখা প্রয়োজন বলে মনে করি। আবিষ্কারের কথা যথাস্থানে প্রকাশ করব।

টেলিফোনে দূরবর্তী এক রোগীর সঙ্গে কথা বলছি। হট্ করে এক ভদ্রলোক চেম্বারে প্রবেশ করলেন। একটু বিরক্ত বোধ করলাম। পাকা বাঁশের মত চেহারা। পরণে লুঙ্গী, গায়ে পাঞ্জাবি। চেনা মনে হল। ইঙ্গিতে বসতে বললাম। তিনি সশব্দে চেয়ার টেনে বসে পড়লেন।

রিসিভার নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম।

ভদ্রলোক খাতা-থেকে-ছেঁড়া একটা লাইন-টানা পাতা আমার হাতে দিয়ে হড়বড় করে কি-সব বলতে লাগলেন। তাঁর নিচের পাটির দুটো দাঁত ভাঙা। থুথু ছিটকাতে লাগল। আমি একটু সরে বসলাম।

ভদ্রলোকের কথা শুনে বিরক্ত ও বিব্রত হলাম। বলে কিনা বাংলা-বন্‌ধের দিন দুপুরে আমি তাঁর বাড়ি কল-এ গিয়েছিলুম। আমার ত স্পষ্ট মনে আছে তখন আমি নিদ্রাদেবীর কোলে।

'দেখুন মশাই!' আমি বলি, 'আপনি ভুল করছেন। অন্য কোন ডাক্তার গিয়ে থাকবেন। আমি না।'

ভদ্রলোকটি আমার দিকে বড়ো বড়ো চোখে তাকাল। তিনি বললেন, 'সে কী ডাক্তারবাবু! এক হপ্তা হয়নি। এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? মলয়পুরের আব্দুল লতিফকে আপনি চেনেন নিশ্চয়ই।'

'বিলক্ষণ—বিলক্ষণ', আমি বলি, 'তাঁর বাড়ি অনেকবার কল-এ গেছি।'

'আব্দুল লতিফের বাড়ির সামনের দোতলা আমার।'

মনে পড়ল। বললাম, 'অহো, বুঝেছি। আপনিই তাহলে রাজা-সায়েব মানে আব্দুল খলিল?'

'জী হাঁ।'

'বলছেন, বাংলা বন্ধের দিন দুপুরে আপনার বাড়ি কল-এ গিয়েছিলুম। আপনার ঠিক মনে আছে?'

'প্রেসক্রিপশন দেখলেই ত বুঝতে পারবেন।'

'ঠিক বলেছেন।'—এই বলে ছেঁড়া-পাতাটা চোখ বুলিয়ে নিলাম।

তাজ্জব ব্যাপার। আমার হাতের লেখার সঙ্গে হুবহু মিল, এমন-কী সইটাও। তারিখ? হ্যাঁ ঐদিনই ত বাংলা বন্ধ ছিল। ধাক্কা খেলাম।

মনের ভাব গোপন রেখে বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে। আব্দুল লতিফের সঙ্গে আপনিই ত কল্ দিতে এসেছিলেন। আর রোগী হচ্ছে আপনার ছেলে। তাই না?'

'জী হাঁ।'

'এখন সে কেমন আছে?'

রাজাসায়েব বলতে শুরু করলেন, 'আপনি দেখে আসবার কিছুক্ষণ পরে নাক দিয়ে রক্ত পড়া আপনা-আপনি বন্ধ হয়। বন্ধের দিন। বাস বন্ধ। সাইকেল চেপে যেতে হবে শহরে। রাস্তা ত কম না। তাই সেদিন ওষুধ আনতে পারিনি। পরের দিন সকাল থেকে ওষুধ চলছে। আজই সব ফুরিয়ে গেছে। আপনি বলেছিলেন নাক-গলা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে। কোন্ ডাক্তারের কাছে যাব? দয়া করে যদি একটা চিঠি লিখে দেন।'

কথাগুলো চুপ করে শুনছিলাম। আর আবছা অন্ধকার হতে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল একটা চিত্রপট। তল্লাসী দৃষ্টি দিয়ে একবার পরখ করে দেখলে হয়।—এই মনে করে আমি বললাম, 'থাক, এখন আর বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হবে না। নাকের ভেতর ঘা (ulcer)। ওটা আমিই সারিয়ে দিতে পারব। তবে রোগীকে আর একবার দেখা দরকার।'

'বেশ ত। কবে যাবেন বলুন?'

'আচ্ছা দেখছি।'—এই বলে ডায়েরির পাতা উল্টালাম। 'আজ ত বেস্পতিবার। সামনের রোববার দুপুরের দিকে আমার ফুরসত আছে। তাহলে ঐদিন যাব।'

'ঠিক আছে।' তিনি কয়েকটা দশ টাকার নোট বের করে বললেন, 'আপনার ফিস্‌টা রাখুন।'

আমি মাথা নেড়ে বলি, 'এখন না। আপনার বাড়ি গেলে তখন

দেবেন। রোগী দেখি তারপর।'

রাজা সায়েব বলেন, 'না না ডাক্তারবাবু, আপনার বোধ হয় মনে নেই। সেদিন আপনাকে ফিস্ দিতে গেলুম। কিন্তু আপনি বললেন, আমার চেম্বারে পাঠিয়ে দেবেন।'

'তাইতো। একেবারে ভুলে গেছি। ঠিক আছে। নমস্কার।'

রাজা সায়েব সেলাম জানিয়ে বিদায় নিলেন।

আমি একাকী চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। গলগল করে ধোঁয়া বের করে স্মৃতিমন্থন করে চলি।

*

সেদিন শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল। উপরন্তু বাংলা বন্ধ্। ভালই হল। বিকেলে রোগী-টোগী তেমন হবে না। পুরো একটা দিন ছুটির আমেজ। নিশ্চিন্তে লম্বা ঘুম দেব ঠিক করলাম।

দুপুরবেলা অল্পসল্প খেয়ে শুয়ে পড়ি। সিলিং ফ্যানটা মৃদুগতিতে ঘুরতে লাগল। বুকের উপর একটা মেডিকেল জার্নাল রেখে পড়ছি। অভ্যেসটা পুরানো। শুয়ে বই না পড়লে ঘুম আসে না। কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। আচমকা দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

নিচে নেমে সদর দরজা খুলে দিলাম। দুজন ভদ্রলোক সেলাম ঠুকে দাঁড়ালেন।

একজন আব্দুল লতিফ। আমার পূর্ব পরিচিত। মলয়পুরের অধিবাসী। বয়েস চল্লিশের কোঠায়। ইদানীং ভুঁড়ি বাগিয়েছেন। রাজনীতি করেন। তবে মস্তান-টস্তান পুষতে কখনও দেখিনি। বেশ পয়সাওয়ালা। স্থানীয় সবাই তাঁকে সমীহ করে।

লতিফ সায়েব তাঁর সঙ্গী আব্দুল খলিল ওরফে রাজা সায়েবের সাথে আমার পরিচয় করে দিলেন। তাঁরই সমবয়সী। নিকট প্রতিবেশী।

লতিফ সায়েব বললেন, 'এনার বড়ছেলের নাক-মুখ দিয়ে হঠাৎ গলগলিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। গেরামের ডাক্তারকে দেখান হয়েছে। কিন্তু রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। ছেলে খুব কাহিল হয়ে পড়েছে। ভেবেছিলুম হাসপাতালে নিয়ে যাব। আজ আবার বাংলা বন্ধ। তাই নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে এসেছি। আমার অনুরোধ, একবার আপনাকে যেতে হবে।'

আমি বলি, 'কী করে যাই বলুন তো? আমার মোটর এখন গ্যারেজে। মেরামতির জন্য দিয়েছি।'

লতিফসায়েব বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলব ডাক্তারবাবু ?'

'না না মনে করবার কী আছে। বলুন।'

লতিফসায়েব হাত জোড় করে বললেন, 'আমার সাইকেলে চলুন-না। আস্তে আস্তে চালাব। কোন কষ্ট হবে না।'

'হুমড়ি খেয়ে পড়লে দুজনারই হাড়গোড় ভাঙবে।'

'লতিফসায়েব আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'না না ডাক্তারবাবু, কোন ভয় নেই।'

আমি বলি, 'তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। আমার একটা ভাল জাতের সাইকেল আছে। একসময় চাপতাম এখন চাপি না। পড়ে রয়েছে। ওটা চেপেই না হয়—'

লতিফ ও রাজাসায়েব আগে-আগে সাইকেল চালাচ্ছেন। আমি ধীরে ধীরে। আকাশে বৃষ্টি আর রোদ্দুরের লুকোচুরি। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি মাথায় পড়ল। জোরে প্যাডেল করতে লাগলাম। একটা দামাল গতি তুলে চোখের পলকে ওদের দু'জনকে টেক্কা মেরে বেরিয়ে গেলাম।

অনেক দূর এসে পড়েছি। পিছনের দু'জনকে দেখা যায় না। বৃষ্টির ছাঁটে জামা ভিজে গেছে।

হঠাৎ মনে হল, মাথায় বা গায়ে আর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে না। অথচ বৃষ্টিপাতের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি! একী কাণ্ড! প্রকৃতি কী আমার সঙ্গে রসিকতা করছে ?

এবার পিচ-রাস্তা ছেড়ে দু'কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা। দেখি, কাদা হয়ে গেছে। এঁটেল কাদা। চাকা ঘুরতে চাইছে না। ভাবলাম সাইকেলটা যদি হেলিকাপটারের মত উড়ে যেত, তাহলে রাস্তার এই নিষ্ঠুর তামাসা সহ্য করতে হতো না।.

যেই ভাবা, অমনি দেখি, সাইকেল হাত দুই উপরে উঠে হাওয়ার বেগে আপনা-আপনি উড়ে যাচ্ছে। ভয়ে আমি হ্যাণ্ডেল জোরে চেপে ধরলাম।

ঝড়ো হাওয়ার বুকে ভর করে রাস্তার উপর ভাসতে ভাসতে পৌঁছে গেলাম রাজাসায়েবের বাড়ির কাছে একটা বড় আমগাছের ঝুঁকে-পড়া ডালপালার নিচে। ব্রেক কষতেই গাড়ি থেমে মাটি স্পর্শ করল।

তখন মেঘ কেটে গেছে। বেশ চড়া রোদ উঠেছে। গাছের মোটা

গুঁড়িতে সাইকেল ঠেকিয়ে রেখে রাজাসায়েবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। জামা-প্যান্ট প্রায় শুকিয়ে গেছে।

এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হল, এই রে! স্টেথস্‌কোপ ত আনা হয়নি। এখন উপায়?

একী! একী! অবাক কাণ্ড। যন্ত্রটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে আসছে হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে। একেবারে সামনে এসে লম্বা হয়ে শূন্যে ঝুলতে লাগল। সেটা গলায় ঝুলিয়ে নিলাম।

অনেক পরে লতিফ ও রাজাসায়েব ভিজে জামাকাপড়ে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে হাজির হলেন। আমায় দেখে ওঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

ঘরে ঢুকে ছেলেটিকে পরীক্ষা করলাম। বেশ তাগড়া চেহারা। বয়েস পনেরো ষোলো। বাঁ-পা সরু লিকলিকে। একটু খাটো। বুঝলাম, পলিওমাইলাইটিস্। পায়ের পেশীগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে। নাকের ভেতর ঘা (আলসার)।

রাজাসায়েব লাইন-টানা খাতা থেকে পাতা ছিঁড়ে দিলেন। কলম? বুক পকেট হাতড়ে দেখি কলম নেই।

'সঈদা, সঈদা।' রাজাসায়েব চেঁচিয়ে বললেন, 'শিগ্‌গির একটা কলম নিয়ে আয়।'

আট-দশ বচরের একটি মেয়ে কলম নিয়ে এলো।

আমি খসখস করে প্রেসক্রিপশন লিখে রাজাসায়েবের হাতে দিয়ে ওষুধ খাবার নিয়ম বলে দিলাম। তিনি ফিস দিতে হাত বাড়ালেন।

আমি বললাম, 'এখন না। চেম্বারে দিয়ে আসবেন।'

ফিরতি পথে একা আসছি। তখন মনে মনে বললাম, 'এত কষ্ট করে ফেরা কি দরকার? আমি যা ইচ্ছে করব তাইত হবে। দেখা যাক—'

সাইকেল ও স্টেথস্‌কোপটাকে বাড়ি চলে যাবার জন্যে আদেশ করলাম। চোখের পলকে ও দু'টো উধাও।

তাহলে আমি-বা কষ্ট করি কেন?

আমি শূন্যে ভাসতে ভাসতে বাড়ি ফিরছি। কত লোক রাস্তায়। আশ্চর্য! কেউ আমার দিকে তাকাল না। বুঝলাম, ওরা আমায় দেখতে পাচ্ছে না। কী অদ্ভুত ব্যাপার!

বাড়ির দরজা বন্ধ দেখে কলিং-বেল টিপলাম। বেল বাজল না। দরজার কড়া নাড়লাম। কেউ সাড়া দিল না। আমি ত ইচ্ছে করলেই দরজা

খুলে যাবে। কিন্তু খুলল না। দারুণ রাগ হল। দরজায় মারলাম সজোরে এক লাথি। দুম করে শব্দ হল। বাস! ঘুম ভেঙে গেল। দেখি ডান পা বিছানার পাশে দেওয়ালে লেগে। ধাক্কা খেয়ে পায়ের পাতা টনটন করছে। গায়ের জামা ঘামে ভিজে সপসপে। উপরে তাকাতেই ফ্যানটা নজরে পড়ল। নড়াচড়া বন্ধ। বুঝলাম লোডশেডিং।

*

রোববার এসে গেল। প্রতিশ্রুতি মতো ছুটলাম রাজাসায়েবের বাড়ি, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর সত্যাসত্য বিচার করতে। প্রথমে আমগাছটার উপর ফেললাম অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি। স্বপ্নের সঙ্গে মিলে গেল। রোগী দেখলাম। হ্যাঁ সত্যিই ত বাঁ-পা সরু লিকলিকে। নাকে ঘা রয়েছে, তবে অনেকটা শুকিয়ে গেছে। রাজাসায়েবের মেয়েকে জিগোস করতেই সে কলম দেবার কথা স্বীকার করল।

রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। রাজাসায়েব একটি গ্লিসারিন সাবান দিলেন। মগ থেকে জল। হাত দুটো পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেললাম।

বৈঠকখানায় ফিরে গদি-আঁটা চেয়ারে বসলাম। বড়ো সাইজের ঘর। বেশ সাজানো গোছানো। খান-তিনেক চেয়ার, সানমাইকা বসানো ঝকঝকে মাঝারি সাইজের টেবিল, সোফা, কোণে ছোট টুলের উপর বসানো রেডিও, দেওয়ালে ফুলদানি। তাতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ।

তাঁর রুচির প্রশংসা করতে হয়। নবাবী চালটা বজায় রেখেছেন এখনও।

লতিফসায়েব ঘরে ঢুকলেন। সেলাম করে কুশল প্রশ্ন করলেন। সোফার উপর বসলেন। রাজাসায়েব নিজেই দু'হাতে একটা ট্রে নিয়ে এলেন। সেটা টেবিলের উপর রাখলেন। প্লেটে সাজানো পরোটা, ডিমের ওমলেট, আলুর দম, আর তিন-চার রকমের মিষ্টি। কাঁচের গেলাসে জল, আর সরবৎ।

আমি বললাম, 'এত খেতে পারব না। সামান্য খাচ্ছি। কিছু মনে করবেন না।'

খাওয়া শেষ করেছি এমন সময় হাজির হলো রাজাসায়েবের স্ত্রী খতিজা। টেবিলের উপর ধোঁয়া-ওঠা চায়ের কাপ রাখলেন। সরবৎ যে খাইনি তা কি উনি দেখেছিলেন?

রূপসী মহিলা। দেহের গঠন ছন্দোময়। সাধাসিধে শাড়ি পরা। চোখেমুখে ক্লান্তির ছাপ। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'আজ-কাল জামাইবাবুরাও এমন আদরযত্ন পায় কিনা সন্দেহ।' খতিজা রাঙা ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির ঝলক তুলে চুপ করে রইলেন।

এক ঢোক চা খেয়ে রাজাসায়েবের দিকে মুখ তুলে তাকালাম। বললাম, 'জানেন রাজাসায়েব আপনাকে কিন্তু একটা মিথ্যে কথা বলে ফেলেছি।'

রাজাসায়েব বেশ চমকে গিয়ে জিগেস করলেন, 'কী কথা ডাক্তারবাবু?'

আমি বলি, 'সেদিন কিন্তু আমি আপনাদের বাড়ি আসি নি।'

খতিজা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সে কী ডাক্তারবাবু, আমাদের সকলের চোখ কী খারাপ? দেখতে ভুল হয়ে গেল?'

আমি বলি, 'হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই দেখেছেন। তবে আমায় নয়। আমার মতো দেখতে অন্য এক ডাক্তারকে।'

রাজাসায়েব বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনার প্রেসক্রিপশনটা?'

হাসতে হাসতে আমি বলি, 'ওটা নকল।'

রাজাসায়েব জোর গলায় বলে উঠলেন, 'ধুৎ, দিনের বেলা কী আমরা ভূত দেখলাম? আপনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন।'

লতিফসায়েব এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এবার নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, 'দেখুন ডাক্তারবাবু আমার সব মনে আছে।'

আমি ভ্রূ কুঁচকে জিগেস করি, 'কী?'

লতিফসায়েব বলতে আরম্ভ করলেন, 'সেদিন যেভাবে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে এলেন, দেখে আমার একটু খটকা লেগেছিল। আর আপনার সাইকেল চালানোর ধরণও অদ্ভুত মনে হয়েছিল। তারপর আম-গাছতলায় আপনাকে দেখে কৌতূহলের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। আপনার জামা-কাপড় শুকনো আর সাইকেলে একছিটে কাদা লাগেনি। অথচ আমরা ভিজে ঢোল আর সাইকেল দুটো কাদায় মাখামাখি। তখন রোগীর ভাবনায় অস্থির। আরও অবাক হলাম যখন আপনি ফিস্ না নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। তখনও রাস্তা কাদায় চটচটে। হয়ত আপনাকে সাইকেল ঠেলতে হবে। আপনার কষ্ট হবে।—এই চিন্তা করে দৌড়তে দৌড়তে আমি রাস্তায় বেরিয়ে আসি। কিন্তু আপনাকে দেখতে পেলাম না।

এখন আপনার মুখে সব শুনে বুঝতে পারছি ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে।'

আমি মাথা নেড়ে বলি, 'তাহলে বেশ গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছেন ত।'

রাজাসায়েব জিগেস করলেন, 'কী ব্যাপার বলুন ত ডাক্তারবাবু?'

আমি স্মিতহাস্যে বলি, 'এর মধ্যে অবাক হবার কিছুই নেই। ভূতটুত বা কুসংস্কার-টুসংস্কার না। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঘটনা। তবে এরকম ব্যাপার খুব কমই ঘটে। তাই মনে হয়, বিচিত্র। যদি হামেশাই ঘটত তাহলে লোকে একে স্বাভাবিক বলেই ধরে নিত।'

খতিজার চোখে কৌতুকের ঝিলিক। তিনি বলে উঠলেন, 'ছাইপাঁশ আমার মাথায় ত কিছুই ঢুকছে না।'

'ঢুকবে, ঢুকবে।' আমি প্রত্যয়ের সুরে বলি, 'ব্যস্ত হবেন না। নিজের মধ্যে যে নিবিড় অনুভূতি আবিষ্কার করেছি সেটা বলছি:

'আপনাদের বাড়ি সেদিন যিনি গিয়েছিলেন, তিনি হলেন আমার ছায়া। পুরো ঘটনাটা আমি স্বপ্নে দেখি যেমন চলচ্চিত্রের পর্দায় লোকে ছবি দেখে। আমার স্বপ্ন দেখা আর ডাক্তারের আপনার বাড়িতে রোগী দেখতে যাওয়া—এই দুটো ঘটনা আশ্চর্যরকম মিলে গেছে। কী করে এমন অঘটন ঘটল একটু খুলে বললেই বুঝতে পারবেন।'

আমি সিগারেট ধরালাম। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলি, 'আপনারা যাঁকে আল্লা বলেন, আমরা তাঁকে ভগবান বলি। আসলে একটা মহাশক্তি। এই শক্তিই সকলের মধ্যে ক্রিয়া করে। সুকুমার অনুভূতির দ্বারা এটা বোঝা যায়।

'ছেলের অসুখ দেখে আপনারা সকলে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তখন আপনাদের মনে একটা ইচ্ছা জাগ্রত হয়—এখনই ভাল ডাক্তার চাই।

'কোন্ ডাক্তার? না আমাকে। ঠিক ত?'

সকলেই হতভম্ব হয়ে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

আমি আবার বলতে সুরু করি, 'আপনাদের সকলের ইচ্ছাশক্তি একত্রীভূত হয়ে একটা প্রবলরূপ ধারণ করে আমার ভেতরকার মহাশক্তিকে আকর্ষণ করে। তার ফলে মহাশক্তি এক মায়াজালের সৃষ্টি করে। এই মায়াজালের কবলে পড়ে আপনাদের মতিভ্রম (হ্যালুসিনেশন) হয়। আপনারা আমাকে দেখলেন এবং আমার কথা শুনলেন। প্রেসক্রিপশনটাও মায়াশক্তির কারসাজি। আর আমি অবচেতন মনে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম।'

রাজাসায়েব জিগ্যেস করলেন, 'তাহলে কী এই মহাশক্তির প্রভাবেই রক্ত পড়া সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হল?'

আমি বলি, 'তা ঠিক না। আপনাদের গেরামের ডাক্তারবাবু ত ওষুধ দিয়েছিলেন। সেটার ক্রিয়াও হতে পারে।'

আমি ব্যবস্থাপত্র লিখে রাজাসায়েবের হাতে দিলাম। অষুধ খাবার নিয়মকানুন বুঝিয়ে দিয়ে বললাম, 'এখন তা হলে উঠি।'

রাজাসায়েব শশব্যস্তে পকেটে হাত দিয়ে বললেন, 'আপনার ফিসটা…।'

আমি হাত নেড়ে বললাম, 'না। আজকের ফিস তো সেদিন আগাম দিয়ে এসেছেন।'

চার

অলৌকিক সত্তা

দেখুন, একটুও বাড়িয়ে বলছি না। দেশের হাওয়া যে বদলে গেছে, সেটা টের পাবেন পুজোর কিছুদিন আগে থেকে। তখন হতো পশুবলি আর এখন হয় নরবলি। চাঁদা দিতে হবে দাবিমতো, আপনার ইচ্ছামত নয়। না-দিলে? অনেক হুজ্জত। আইনের আশ্রয় নেবেন? তাহলে মান ত দূরের কথা, জান নিয়ে পড়বে টানাটানি! যাক এসব পুরানো কাসুন্দি।

হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম, তখন শরৎকে চাঁদার এ কলঙ্ক নিয়ে আসতে দেখিনি। দেখেছি তাকে নীলাকাশে সাদা মেঘের ভেলায়।

এমনি এক ঝকঝকে শরতের সকালে খোসগল্প করছিলাম ঋষিবাবুর সঙ্গে। পুরো নাম ঋষিকেশ রায়। তবে নামের সাথে দেহের বা কাজের কোন মিল নেই। বয়েস-ঘড়ির কাঁটা ষাট পেরিয়ে গেলে কি হবে, দেহ এখনও তুমড়ে যায়নি। বেশ মজবুত। আগে জল-পুলিশে কাজ করতেন। এখন অবসর। তিনি আমার প্রতিবেশী।

'পুজোর আগে ছেলে ভাল হবে তো ডাক্তারবাবু?' তিনি জিগোস করেন।

আমি চটপট জবাব দিলাম, 'ভালোর আর বাকি কী আছে? আজ জ্বর ছেড়েছে, সাতদিন। আগামীকাল ভাত পাবে। তারপর দিন-সাতেক বিশ্রাম নিলেই চলবে।'

'না, বলছিলাম কী, অসুখটা ত সুবিধের নয়। যদি কিছু গণ্ডগোল পাকায়?'

আমি তখন জোর গলায় বলি, 'দূর মশাই। টাইফয়েড আজকের দিনে আবার একটা অসুখ নাকি? ক্লোরোমাইসিটিন। একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র। অবশ্যি এটা আবিষ্কৃত হবার আগে রোগটা খারাপই ছিল। এখন আর সে ভয় নেই। বুঝলেন ঋষিবাবু?'

এমন সময় ঋষিবাবুর এক বুড়ো চাকর হাঁপাতে হাঁপাতে চেম্বারে ঢুকল। কোনো প্রশ্ন করবার আগেই সে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'দাদা-মনির আবার জ্বর এসেছে। কাঁপুনি দিয়ে। হেঁচকি উঠছে।'

দাদামণির পোশাকি নাম, অভিজিৎ। ঋষিবাবুর একমাত্র সন্তান। বয়েস বেশী না। সাতাশ-আটাশ হবে।

ঋষিবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বিব্রতস্বরে বললেন, 'কী হবে ডাক্তারবাবু? একবার চলুন তবে।'

এ-রকম ঘটনার জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তখন বেলা হয়েছে। আকাশের রঙ বদল হচ্ছে। শুকনো খটখটে রাস্তার উপর দিয়ে আমরা চলেছি। বেশ জোরে। ঋষিবাবুর বাড়িতে ঢুকে দেখি, ঋষিবাবুর স্ত্রী মাটিতে মাথা খুঁড়ছেন। তাই দেখে ঋষিবাবু আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন। বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে কেউ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর কেউ বুক চাপড়াচ্ছে। আর ঐ বুড়ো চাকর? সেইতো দাদামণিকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছে। নিজের হাত দিয়ে মাথায় ঘুষি মারছে আর উঠানের এমুড়ো-ওমুড়ো পাগলের মতো ছুটাছুটি করছে। সে এক করুণ দৃশ্য।

ছেলেটিকে ভাল করে পরীক্ষা করলাম। দেখলাম, তার ধ্যাননিমগ্ন মুখমণ্ডলে শারদ খুশির শুভ্রতা। আর গেরস্থ বাড়িটি ডুবে গেছে বর্ষার বিষণ্ণতায়।

হিংসুটে মৃত্যুর সঙ্গে অনেকবার পাঞ্জা কষেছি। সহজে হার মানিনি। আজ সে কাপুরুষের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর আমি হেরে গেলাম। কী আফশোস।

জন্মের মতো মৃত্যুও সত্য। চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হয়তো মৃত্যুকে কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু একদিন না-একদিন মৃত্যু ঝাঁপিয়ে পড়বেই। এটা চরম সত্য, জানি। তবুও আমার মন মানতে রাজি হচ্ছে না। কতক্ষণ স্বপ্নাবিষ্টের মতো বসেছিলাম জানি না। হুঁশ হল ঋষিবাবুর ডাকাডাকিতে: 'ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু। শিগগির আসুন।'

নিমেষে কেটে গেল জড়তা। তখন মনে হল পেশীতে একটা বাড়তি শক্তি ভর করেছে। তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। দৌড়ে রোগীর কাছে।

এ কী ব্যাপার! ভোজবাজি নাকি? হাত-পায়ের আঙুল অল্প অল্প নড়ছে। দেখি নাড়ি। হাঁ, বেশ তো দোলকের মতো তালে তালে নাচছে। বুক-পেট শ্বাস-প্রশ্বাসের তালে তালে উঠা-নামা করছে। দেখি দেখি হৃদ্‌যন্ত্রটা। কানে নল লাগালাম। বাঃ বাঃ বেশ তো জোর-কদমে কাজ করছে। ঐ তো ঠোঁট দুটো নড়ে উঠলো। তাই না? পকেট থেকে

রুমাল বের করলাম। চশমার কাঁচ দুটো সাফ করে ভাল করে দেখি, সত্যিই তো বেশ জোরে-জোরে নড়ছে।

ঘরের মধ্যে তখন নেমে এসেছে এক অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা। রোগীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে একগাদা মেয়েপুরুষ। ঘরসুদ্ধ লোক দম ধরে আমার কাজ দেখছে—আর এক দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে আছে।

'কী মনে হয় ডাক্তারবাবু?'—ঋষিবাবুর আকুল জিজ্ঞাসা।

বললাম, 'আর ভয় নেই।'

'আপনার হাতযশ।'

আমি মাথা নেড়ে বলি, 'উঁহুঁ, এজন্য কৃতিত্ব মোটেই দাবী করি না।'

এবার রোগী ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক করল। মনে হল হাই তুলছে। পরক্ষণেই নিস্তব্ধতা ভেদ করে তার চিৎকারের মত বেরিয়ে এলো স্বর: 'আমি নই, আমি নই। চড়কডাঙার চূড়োমণি।' মনে হল মেশিনগানের মুখ থেকে এক ঝাঁক গুলি বেরিয়ে এলো বুঝি।

রোগী এবার বিছানার উপর খাড়া হয়ে উঠে বসল। এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে বলতে শুরু করল, 'আঃ বাঁচলুম। ভয়ে প্রাণটা হিম। উঃ তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। অনেক কাকুতি-মিনতি করলাম। ওরা এক ফোঁটাও জল দিল না।'

শুনে, আমি বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো চকিত হলাম।

রোগীকে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দেওয়া হল। সে চোঁ-চোঁ করে সবটুকু খেয়ে নিল। ওর মা মুখ মুছিয়ে দিল নিজের আঁচলে। ছেলেটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। চোখে-মুখে আশ্চর্য প্রশান্তি।

আমি ভ্রূ কুঁচকে অভিজিৎকে শুধাই, 'ওরা কারা?'

অভিজিৎ আমার দিকে পিটপিট করে তাকায়। মনে হল সে আমায় চিনতে পারেনি। তারপর সে চোখ দুটো হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে রগড়ে নিয়ে বলতে শুরু করল, 'অহো! ডাক্তারবাবু। আর বলেন কেন? একটা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখলাম। দুটো কাঠখোট্টা লোক, ভীমের মতো চেহারা। কালো মিশমিশে। মাথা হাঁড়ির মতো। ঝাকড়া ঝাকড়া চুল। মুখ-ভর্তি কালো দাড়ি। বড়ো বড়ো চোখ থেকে যেন আগুনের গোলা বেরিয়ে আসছে। কোত্থেকে হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াল, জানি না। আমি তখন ভয়ে জড়োসড়ো। ওরা নিজেদের মধ্যে যেন কী কথা বলল। তারপর দাবনা দুটো মোটা লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে

চলল। আমার সারা দেহ তখন অবশ। উঃ এখনও জ্বালা করছে।'

আমি ঝুঁকে পড়ে দাবনা দুটো পরীক্ষা করলাম। হাঁটুর উপরে উরুর চারপাশে ছড়ে গেছে। দগদগ করছে ছাল-ওঠা জায়গাগুলো।

জিগ্যেস করি, 'তারপর কী হল?'

অভিজিৎ বলল, 'একটু জল।'

অভিজিতের মা ঝটিতি এক গেলাস জল এনে ছেলের মুখের কাছে ধরল। সে দু'ঢোক জল খেয়ে বলল, 'থাক আর খাব না।'

অভিজিৎ একটু জিরিয়ে নিয়ে বলতে লাগল, 'জানেন ডাক্তারবাবু এখনও গা-টা শিউরে উঠছে। কোথায় এলাম বুঝতে পারলাম না। চাদ্দিক গাঢ় অন্ধকার। হঠাৎ কার গলার জোর-আওয়াজ কানে এলো। মনে হল বাজ পড়ল। কে-যেন ধমক দিয়ে বলছে, 'হাঁদারাম, কাকে নিয়ে এসেছিস? এ নয়, এ নয়। চড়কডাঙার চুড়োমণি।' তখন মনে হল দাবনার দড়িতে কে যেন হেঁচকা টান দিল। দড়ি গেল ছিঁড়ে। অমনি স্বপ্ন ভেঙে গেল।'

অবিশ্বাস্য ঘটনা।

অভিনব ও রহস্যময় এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে চেম্বারে ফিরলাম। কারণ এর মধ্যে বুঝে ফেলেছি, নাটকের পরবর্তী অঙ্কে হয়তো আমাকেই অভিনয় করতে হবে।

*

ডাক্তারি-ব্যাগটা খুলে জরুরি ওষুধগুলো ঠিকঠাক আছে কি না পরীক্ষা করছি, হিমু এসে দাঁড়াল। হিমু হল বাড়ির চাকর। খুব চালাক ছেলে। আমি কখন্ কী মেজাজে আছি, বুঝে নিয়ে তবে আমার সঙ্গে কথা বলে। সে সঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম, 'আমার খেতে দেরী হতে পারে। বাড়িতে সবাইকে খেয়ে নিতে বলগে যা। যদি দুধ থাকে, এক গেলাস নিয়ে আয়।' হিমু ইতস্তত: করে চলে গেল।

এমন সময় মোটর-সাইকেলের ভটভট শব্দ। থামল চেম্বারের সামনে। এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকে হাত তুলে নমস্কার করলেন।

আমি প্রতি-নমস্কার করে তার দিকে তাকালাম।

ভদ্রলোক বিনীতভাবে বললেন, 'ডাক্তারবাবু! এখনই আমাদের বাড়ি যেতে হবে।'

'কোথায়? চড়কডাঙায়?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ডাক্তারবাবু। ঠিক বলেছেন।'

মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। তিলার্ধ সময় নষ্ট না করে তার মোটর-সাইকেলে উঠে বসলাম। ভদ্রলোক গাড়িতে স্টার্ট দেবে, হিমু ছুটতে ছুটতে দুধ নিয়ে হাজির হলো। খানিকটা দুধ চলকে পড়ে গেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেলাস হাতে নিলাম। খেলাম।

মোটর-সাইকেল ছুটে চলল। ভদ্রলোকের কাছে জানতে পারলাম, রোগীর নাম চূড়োমণি। বয়েস সাতাশ। ডন-বৈঠক করা চেহারা। সে ভালই ছিল। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম করছিল। হঠাৎ বুকে অসহ্য যন্ত্রণা।

রোগের সঙ্গে লড়াই করবো—এই সংগ্রামী মন নিয়ে চিকিৎসক-জীবন আরম্ভ করেছি। নামের দিকে তত নজর দিইনি। কারণ জানি এদেশের লোক ভাগো বিশ্বাসী। রোগী যখন বাঁচে তখন বলে ডাক্তারের হাতযশ আর যখন মরে তখন বলে রোগীর কপাল।

যাহোক এক্ষেত্রে আমার হাতযশ যে কোন কাজে লাগবে না তা আগে থেকে আন্দাজ করে নিয়েছি।

রোগীর বাড়িতে পেঁীছে দেখি, আমার আর লড়াইয়ের প্রয়োজন নেই। ফাঁকা মাঠে গোল হয়ে গেছে।

এই রহস্যময় ঘটনার চাবিকাঠি খুঁজেছি বারে বারে। হদিশ পাইনি। আপনাদের কারো জানা আছে?

পাঁচ

দিগ্‌ভ্রম

গানের মাঝে তাল কেটে যাবে আর সুর হবে বেসুরো। বুড়ো-বুড়ি জড়ভরতের মতো বসে থাকবে আর কচিকচি নাতি-নাতনীর দল পঞ্চভূতে বিলীন হবে। এ কেমন কথা? মৃত্যু বারে বারে হানা দেবে, কোন কৈফিয়ৎ চাওয়া চলবে না? শিকারলোভী নেকড়ের মতো সে ওঁৎ পেতে বসে থাকবে। ঘাড় মটকাবে। এ অনিবার্য নিয়তি। একে কে ঠেকাবে? ডাক্তার যা পারে তা সামান্য—প্রতিরোধ।

এরকম মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামই হল আমাদের এই রোজনামচা।

তখন রাত্তির দেড়টা। বেলাল সায়েব হাতজোড় করে বললেন, 'মাপ করবেন ডাক্তারবাবু! আপনাকে বিরক্ত করছি। এখনি আমার বাড়ি যেতে হবে। ছেলের অসুখ। রাত বারোটা থেকে বাহ্যে-বমি। ঘন্টায় পঁচিশ-ত্রিশ বার। বছর দশেকের বাচ্চা। আর কতক্ষণ যুঝবে? আমার বুড়ো বাবা-মা এখনও বেঁচে। তাঁরা ছেলের অবস্থা দেখে কেঁদে অস্থির।'

আমি বলি, 'বিলেতপুর কদ্দূর? সাত-আট কিলোমিটার, কী বলুন?'

বেলাল সায়েব সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ তাই হবে, ডাক্তারবাবু!'

আমি বলি, 'বেশীর ভাগই ত কাঁচা রাস্তা। ঠিক আছে। মোটর-সাইকেলে আধঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাব। আপনি ত সাইকেলে এসেছেন। বরং আগে চলে যান। আমি যাচ্ছি।'

বেলাল সায়েব বিদায় নিলেন। ব্যাগ গুছিয়ে নিতে একটু দেরি হল। রাস্তার ধুলোর কথা ভেবে পাজামা আর হাফসার্ট পরে নিলাম।

রাত বেড়ে গেছে। শেষ-ফাগুনের উপচে-পড়া জোছনা। চারদিক নিস্তব্ধ। বেরোবার মুখে এক বিপত্তি। নিস্তব্ধতা ভেঙে হঠাৎ ঘূর্ণি-ঝড়। সোঁ-সোঁ গর্জন। গাছের ডালপালায় তাণ্ডব। ধুলো-বালির ঝাপটায় সারা অঙ্গ মাখামাখি। অবশ্য মিনিট দু-তিনেকের জন্যে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

এক কিলোমিটার মতো পিচঢালা রাস্তা। ঠাণ্ডা-গরম হাওয়ায় যেন একটা পাহাড়ী সাপ ঘুমিয়ে আছে। তীব্র আলোর ছোরায় তার বুক কেটে

পথ করে নিল আমার মোটর-সাইকেল। পাকা রাস্তা শেষ। পোঁছে গেলাম বিরাটি। এবার গেরামের পথ। কাঁচা, উঁচুনীচু। খাড়া দখিনে যেতে হবে।

গেরামের মানুষ। চাষাভুসো। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটা-খাটনির পর ঘুমে কাদা। বাইরে যন্ত্রদানবের তর্জন-গর্জনের শব্দ তাদের কানে ঢুকল না। তবে ছুটে এলো বিনা-মাইনের প্রহরীরা ঘেউ ঘেউ করে।

তেমাথার মোড়ে পোঁছে গেলাম। বেশ চওড়া। তেমাথার দখিনে রাস্তার সঙ্গে লাগা একটা মাটির টিপি। এর উপর পাহারাওয়ালার মতো দাঁড়িয়ে আছে বেল গাছ। প্রায় দু-মানুষ সই উঁচু। মোটা-সরু ডালপালা।

পুবমুখো চলেছি। দুধারে ঝোপঝাড়। চারদিকে ফাঁকা মাঠ। মাঠের পরে বাঁক। রাস্তা এখানে সরু. দখিনে চলে গেছে সিধে বিলেতপুর।

বেলাল সায়েবের বাড়ি যেতে হলে রাস্তা ছেড়ে গেরামের মধ্যে ঢুকতে হবে। গেরামের রাস্তা তত চওড়া না। পুবদিক থেকে বিলেতপুর সময় কম লাগবে ভেবে বাঁদিকের রাস্তা ধরে এগুতে লাগলাম। বাঁকের কাছে এসে মোড় ঘুরলাম। দু'কিলোমিটার রাস্তা যেতে হল মাঠের মাঝখান দিয়ে। বড্ড এবড়ো-খেবড়ো। ঝাঁকুনি খেতে হচ্ছে। আবার মাঠ! ততটা সরু না। চওড়া। গাড়ি জোরেই ছুটছে। রাস্তা শেষ হয়ে এল বলে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেছি। নিজের অজান্তেই চমকে উঠলাম। একী ব্যাপার! সেই তেমাথার মোড়ে ফিরে এসেছি আবার। বেলগাছ, সাঁকো—সবই ত দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। আমি যেন বৃত্তাকার পথে ঘুরে এলাম। না, অসম্ভব। এ-রাস্তা আমার অনেকদিনের চেনা। কোনদিন ত এরকম হয়নি। একটু খটকা লাগল।

দেখি, কী ব্যাপার। তাই আবার বাঁদিকের রাস্তা ধরে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম। দেরি হয়ে গেছে। তাই জোরেই গাড়ি চালাচ্ছি।

দূর থেকে বেলগাছটা আবছা দেখতে পাচ্ছি। দ্রুত এগুতে লাগলাম। কী সর্বনাশ! আবার সেই তেমাথার মোড়ে। ব্যাপারটা খুব গোলমেলে মনে হল। কোথায় নিশ্চয় ভুল হয়ে যাচ্ছে। একটু ভেবে গাড়ি চালিয়ে দিলাম ডানদিকের রাস্তা দিয়ে। লক্ষ্য হরিদাসপুর হয়ে যাব বিলেতপুর। জোরেই চালাচ্ছি।

হা ভগবান! কোথায় হরিদাসপুর? ঘুরে ফিরে ফের বেলতলায়।

বেশ ঠেক খেলাম দেখছি। এমনতরো ঘটবে-কল্পনাও করিনি।

গোলকধাঁধার মধ্যে পড়লাম বটে। এখন কী করা যায়? পিছনে হটবো না সামনে এগুবো? এমন সময় টিকটিক শব্দ। এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম। দেখি, একটা বড়োসড়ো গিরগিটি গুঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে। অনিচ্ছায় বাড়ি ফেরবার পথে গাড়ি হাঁকিয়ে দিলাম। বেলাল সায়েবের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেব? এসব আজগুবি ঘটনা কাউকে কী বলা চলে? বললেই বা কে বিশ্বাস করবে?

সামনে বিরাটি। গ্রামে ঢুকবো—দূর থেকে একটা ক্ষীণ আলো আমার নজর কেড়ে নিল। কাছে যেতেই দেখি এক বয়স্ক লোক। বাঁ-হাতে শিস-উঠা হ্যারিকেন। কাঁচে কালি লেপটে গেছে। ডান হাতে লাঠি। মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে চলেছে। আমি গাড়ী থামালাম।

সে আমার মুখের সামনে হ্যারিকেন তুলে একটু ঝুঁকে শুধাল, 'কে গো?'

হ্যারিকেনের আলো তার মুখেও পড়েছে। চিনতে পারলাম। 'সনাতন নাকি? চিনতে পারছিস না?'

'অহো ডাক্তারবাবু! তা এত রাত্তিরে কোথায় গেছলি?' সে বয়সে বড়ো। জীর্ণ চেহারা। আমাকে 'তুই' সম্বোধন করে।

বললাম, 'আমাদের যা কাজ। রোগী দেখতে। তা তুই কোথা যাচ্ছিস?'

সনাতন বলল, 'আর বলিস কেন ডাক্তারবাবু? নাতিটার বিকেল থেকে বাহ্যে বমি। ভেবেছিলাম হাওয়ার দোষ। ঝড়ু ত এখানকার বড়ো ওঝা। ওকেই দেখাচ্ছিলাম। সে ঝাড়ফুঁক করল। জলপড়া খাওয়ানো হল। কিছু হল না। সন্ধ্যের পর রামু মুদীর কাছ থেকে এক পুরিয়া হোমিওপ্যাথি এনে দিলাম। রামুর ওষুধ ত মন্তরের মতো কাজ করে। এর বেলায় খাটলো না। অগত্যো হারাণ-ডাক্তারকে ডাক দিলুম। হাতুড়ে হলে কী হবে? হাতযশ আছে। সে তো এসেই ফটাফট গোটা-কতক সূচ ফুটিয়ে দিল। তবুও কিছু হল না। অবস্থা আরও খারাপের দিকে।'—এই বলে সনাতন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সনাতনের পুরো নাম সনাতন টুডু। এই গেরামেরই বাসিন্দা। নিজস্ব কোন জমিজমা নেই।

আমি প্রবোধ দিয়ে বলি, 'সূচ যখন দিয়েছে, ভাল হয়ে যাবে। ভয় কী?'

সনাতন ধরা গলায় বলতে সুরু করল, 'ছেলে ছটফট করছে। কোন কিছু পেটে তলাচ্ছে না। মুখ দিয়ে রা বেরুচ্ছে না। তাই ফের রামুর কাছে যাচ্ছি।'

আমি বলি, 'তা তুই আমার কাছে যেতে পারতিস তো।'

চোখজোড়া কপালে তুলে সে ঝটতি জবাব দিল, 'কী যে বলিস ডাক্তারবাবু! তোর কাছে যাব! আমাদের এত পয়সা কোথা?'

আমি একটু ঝাঁঝালো স্বরে বলি, 'বেশী পয়সা নিই, কে তোদের বলল?'

সনাতন উত্তর দিল, 'আমি তো তোর কাছেই যাচ্ছিলাম। বাবুরা বাগড়া দিল।'—বলেই সে যেন বিষম খেল। কপালে ভাবনা-রেখা ফুটে উঠল।

কৌতূহলী হয়ে জিগোস করি, 'বারণ করল কেন?'

সনাতন মুখ নিচু করে রইল। বুঝলাম সনাতন ভয় পেয়েছে। তাই সাহস দিয়ে বললাম, 'ভয় কী। সত্যি কথা বলবি, অত ভয় খেলে চলে?'

তখন সে বলল, 'মাপ করবি ডাক্তারবাবু! কারও বদনাম করতে পারব না। বলছি। শোন। বাবুরা বকুনি দিয়ে বলল, 'তোর তো দেখছি পয়সার গরম হয়েছে। ওখানে গেলে ঘটি-বাটি বিক্রি করতে হবে, জানিস?'

আমি কপট রাগ দেখিয়ে বলি, 'পরের মুখে ঝাল খাওয়া তোদের স্বভাব। একবার গিয়ে দেখলি না কেন? তা হাসপাতালে যেতে পারতিস তো?'

'কোন্ হাসপাতালে বলছিস ডাক্তারবাবু?'

আমি বলি, 'কেন? সরকারের হেলথ সেন্টারে।'

'শ্মশানে জ্যান্ত মানুষকে নিয়ে যেতে বলছিস? ওখানে কী ডাক্তার আছে না ওষুধ আছে?' সনাতনের স্বরে ব্যঙ্গ ও বিরক্তি।

আমি বলি, 'শহরে বড় হাসপাতালে?'

সনাতন শ্লেষের সুরে বলল, 'হুঁ, নামেই বড় হাসপাতাল। থানার বড়বাবু আর হাসপাতালের ডাক্তার—তফাৎ কী বলতে পারিস? নগদ পয়সা আহুতি দিতে হবে, বুঝলি? আমাদের মতো গরিব লোক ওখানে পাত্তা পাবে কেন?'

সনাতনের কথার ভঙ্গী দেখে আমি থ'। সে মুখ্যু হতে পারে কিন্তু তার জ্ঞান দেখছি টনটনে।

খানিক চুপ করে থাকি। পরে বলি, 'চল তো দেখি কী অসুখ।'

গেলাম। ছিটে বেড়ার ঘর। মাঝারি মাপের। ছাদ বলতে খড়ের চাল। আর দরজা? একটা আগড়। তাও প্যাকাটির তৈরী। সনাতন আগড় ঠেলে ভেতরে ঢুকল। তার পিছু পিছু গুড়ি মেরে আমি। কী অন্ধকার। টর্চ জ্বাললাম। ইস্ একটু হলে ঠকাস করে মাথা ঠুকে যেত আড়ায়। সনাতন রোগীর পাশে বিছানার উপর পিঁড়েতে আমায় বসতে দিল। বসলাম।

বিছানার পাশে একটা জামবাটি। জলভর্তি। ছেলের মা মাঝে মাঝে তা থেকে জল নিয়ে টোসা টোসা ছেলের মুখে দিচ্ছে। ঘরের কোণে ভাঙা ইটের উপর কেরোসিনের অলন্ত লম্ফ। কালো শিস্ উঠছে।

সনাতন ধরা গলায় বলতে লাগল, 'দেখ ডাক্তারবাবু! আমি ছাপোষা। চারটে নাতি-নাতনি। এই নাতিটাই যা একটু বড়। আমার হাত-নুড়কুৎ। গরু-ছাগল চরায়। হাঁস-মুরগি দেখে। আর জানিস ডাক্তারবাবু, খুব পয়মন্ত। বন্যার বছর হয়েছে। সে বছর পাড়ার সকলের ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে। কিন্তু আমার কিছু হয়নি। ঘর পড়ে গেলে ভোগান্তির একশেষ হতো।'

'হ্যাঁ রে, তোর ছেলেকে ত দেখছি না। সে কোথায়?'

'ওটা হতচ্ছাড়া। কোনও কথা শোনে না। গায়ে ফুঁ দিয়ে ট্যাঙোস ট্যাঙোস করে ঘোরে। বলে পার্টি করছি। যার পেটে ভাত নেই, তার কী পার্টি করা সাজে? তুই বল না?'

আমি জবাব না দিয়ে টর্চের আলোয় রোগীকে পরীক্ষা করতে লাগলাম। বয়স বারো কি তেরো। দেখলে মনে হবে আরও বেশী। একেবারে হাড্ডিসার। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। নাড়ী ক্ষীণ। দ্রুত চলছে। পেটটা ঢুকে গেছে।

সনাতন বলছিল, 'হুঁ পার্টি! একটা পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই। লাফিয়ে চাঁদ ধরা। হাড়ে দুব্বো গজাবে। এই বুড়ো বয়েসে আমাকে কিষেণ খাটতে হচ্ছে! তাও কী ছাই রোজ কাজ জোটে। দু'দিন হয়, তো চারদিন বসে থাকি। এভাবে কী এতগুনো লোকের পেট চলে? অভাবের সংসার। যা হোক করে ঠেকা দিয়ে চালাচ্ছি। দেখ, যদি নাতিকে বাঁচাতে পারিস।' এই বলে সে চুপ করল। তারপর অদূরে মেঝের উপর বসে পড়ল।

সেলাইন দিতে শুরু করলাম। ফোঁটা ফোঁটা সেলাইন জল শিরার মধ্যে ঢুকছে দ্রুতগতিতে। প্রতি ফোঁটায় লুকিয়ে আছে মৃতসঞ্জীবনী সুধার জাদু। মাঝে মাঝে নাড়ি টিপে পরীক্ষা করছি।

কী মুশকিল! একটা বিচ্ছিরি গন্ধ নাকে ঢুকছে। হুঁ পচাইএর। এদের আর কী দোষ দেব? দু'বেলা পেটভরা ভাত জোটে না। তার উপর গরিবের খিদে বেশী। কথায় বলে লক্ষ্মীছাড়ার ভক্তি বাড়া। সস্তা পচাই-এর পাক দিয়ে দুরন্ত খিদেকে দমিয়ে রাখার উত্তম ব্যবস্থা বটে।

ওদিকে সেলাইন-জল বোতল থেকে টপ টপ করে শিরার মধ্যে ঢুকছে নিঃশব্দে।

সনাতন এক সময় জিগ্যেস করল, 'কী রকম বুঝছিস, ডাক্তারবাবু?'

'ভয় নেইরে। এ-যাত্রায় রক্ষে হল।'

সনাতন দমকা শ্বাস ছেড়ে বলল, 'উঃ বাবুদের কথা শুনে কী খারাপই না করে ফেলতুম। আমাদের কী ইচ্ছে যায় না, তোর কাছে যেতে?' শেষটান দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে মন্তব্য ছুঁড়ে দিল, 'ওরাই যত নষ্টের গোড়া।'

আমি বলি, 'এদ্দিনে বুঝলি বুঝি?'

সনাতন বলে, 'তা আর বুঝিনি? হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি ডাক্তারবাবু! একমণ বাড়ি-ধান দিয়ে, দেড়মণ আদায় করে। হাঁস-মুরগি-ছাগল আধা কড়ি দিয়ে কিনে নেয়।'

আমি বিরক্তমুখে বলি, 'আধাকড়ি দিয়ে বেচতে যাস্ কেন? তোদেরই ত দোষ।'

সনাতন ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। বলে, 'হ্যাঁ, যা বলেছিস ডাক্তারবাবু! দোষ আমাদেরই। আমরা মুখ্যু লোক। কী করব বল? আগে থেকেই যদি তোর কাছে যাই, তাহলে অল্প পয়সায় কাজ মিটে যেত। অসুখ ভারী হলে খরচা বেশী হবে, সেটা কী আর বুঝি না। বুঝি সবই, কিন্তু কী করব বল? বিপদে-আপদে বাবুদের কাছেই ত হাত পাততে হয়। ওনাদের কথা না শুনলে, শেষে···। এইতো দেখনা, পাঁচ টাকার মুরগি ওনাদের কাছে দু'টাকায় বেচে রামুর কাছে যাচ্ছিলুম।'

সনাতন একটু দম নিল। তারপর চড়াসুরে হঠাৎ বলতে শুরু করল, 'সব বুঝি। ঝাড়ফুঁক বুজরুকি। মুদীর পুরিয়া ফাঁকা আওয়াজ। স্বার্থপর বাবুদের মুখে ভালমানুষির মুখোশ। ছ্যাচড়া হাতুড়ে ডাক্তার।' ওরা হাড়কাঠ

এভাবে আমাদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে কুসংস্কারের হাড়কাঠে। আমরা বলি হয়ে যাচ্ছি। আর বাবুরা? অসুখ হলে, আজকালকার চিকিৎসার সুযোগ নিচ্ছেন বড়ো বড়ো ডাক্তারের কাছে। দিব্যি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠছে। আর আমাদের মাথার উপর লাঠি ঘোরাচ্ছে।'

সনাতন বলে কী? কোন অলৌকিক শক্তি কী তার জিবে ভর করেছে? না, আঘাত খেতে খেতে তার মধ্যে ঘুমন্ত শক্তি জেগে উঠেছে? বুঝলাম, সনাতনের মতো লোক উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেলে সমাজের কলঙ্ক ভাসিয়ে দিত বিপ্লবের জোয়ারে।

ভোরের মুরগি ডেকে উঠল, কোঁ কোঁকর কোঁ। ছেলেটিকে শেষবার পরীক্ষা করে বললাম, 'নাতি তোর বেঁচে গেল রে। আরও কিছু ওষুধ দরকার। ডাক্তারখানায় যাস।'

বাইরে এসে দেখি, চারদিক ফরসা। মাটি ভিজে ভিজে। কখন বৃষ্টি হয়েছে টের পাইনি।

মোটর-সাইকেলে স্টার্ট দিতে গিয়ে আচমকা থমকে গেলাম। ইস্ বেলাল সায়েবের ছেলে···? তার বাড়িতে তো যাওয়া হল না।

গাড়ির গতিবেগে ঝড় উঠল। চোখের পলকে তেমাথার মোড়ে। আগের রাতের ঘটনা স্বপ্নবৎ মনে হল। গোলকধাঁধার বেড়া ভেঙে গেছে।

পৌঁছে গেলাম বেলাল সায়েবের বাড়ি। তখন ভেতর বাড়ির হাওয়া বদলে গেছে। রাত্তির দু'টোর সময় ঝকমকে পূর্ণশশীর কোলে লুকিয়ে গেছে এক ফালি জোছনা। করার কিছু নেই।

লজ্জায় ও দুঃখে দিলাম গাড়ি হাঁকিয়ে। ফিরে এলাম সেই বেলতলায়। খুব ক্লান্ত বোধ হচ্ছিল।

তাকিয়ে দেখি, সেই গিরগিটটা মড়ার মতো শুয়ে, বেলতলায় ধুলোর উপর। জিবটা বের করা। বেলতলার হাওয়া যেন থমকানো। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়ছে তখনও গাছের পাতা থেকে।

দেখি, সিগারেটের প্যাকেটটা ধুলো-কাদায় মাখামাখি। আমার মন।

ছয়

আংটির প্রত্যাবর্তন

হাওড়া-চন্দননগর একখানা দৈনিক টিকিট আর ফিরতি কিছু টাকা-পয়সা মেয়েটির হাতে দিয়ে ভাবলাম, এবার বুঝি সে আমায় মিষ্টি হাসি উপহার দিয়ে বলবে, 'ধন্যবাদ'। কিন্তু টানা-টানা চোখে সে বিস্ময়ের ঝলক তুলল। আর তখনই ঈগলের মতো আমার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হল তার আধুনিক কায়দায় মেক-আপ দেওয়া মুখ-চোখের উপর। মেয়েটি ভুরুজোড়া কুঁচকে আমার দিকে তাকায়।

আমি সকৌতুকে জিগ্যেস করলাম, 'কী হল?'

মেয়েটির দাঁত সাদা। ঝকঝকে। মুক্তোর মত। সেই দাঁত ঠোঁটে চেপে সে বলল, 'কী আশ্চর্য! একী! আপনাকে তো একশ টাকার নোট দিয়েছি!'

ভাবলাম, বুঝি রসিকতা করছে। এই বয়েসের এই তো ধর্ম। আমিও তাই রসিকতা করে বললাম, 'একশ টাকার নোট তাহলে তোমার ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যেই লুকিয়ে আছে।'

আমার ভুল ভাঙল। মেয়েটি চড়া গলায় বলল, 'না না। ওটা আপনার পকেটেই আছে। ভালোয় ভালোয় বের করুন। না হলে লোক ডাকব।'

বিস্ময়ে হতবাক। একে কী বলে? প্রতারণা?

আশপাশে লোক জমছিল। তারা আমাদের কথা শুনছে। আমি তখন শান্ত গলায় বললাম, 'তুমি তো পাঁচ টাকার নোট দিয়েছিলে। আর এখন একী বলছ? তাছাড়া আমার কাছে মাত্র এক টাকার মতো খুচরো আছে। বিশ্বাস না-হয় দেখতে পারো।'

শুনে মেয়েটির মেজাজ একদম সপ্তমে। কণ্ঠে ঝাঁঝালো স্বর ফুটে উঠল। 'ছি ছি, আপনি না ভদ্রলোক? সেরেফ গাপ মেরেছেন। সরিয়ে ফেলেছেন। টাকা না থাকে আংটিটা খুলে দিন।'

আমিও ধমক দিয়ে বললাম, 'মগের মুল্লুক!'

মেয়েটি হুংকার দিয়ে উঠলো, 'কি! আমি ঠগ? ঠিক আছে। টাকা দিলেই আংটি ফেরৎ দেব। এই নিন আমার ঠিকানা।'—এই বলে মেয়েটি আমার হাতে একটি ভিজিটিং কার্ড দিল।

ইস্ বলে কী? আংটি! দাম সামান্য হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে মূল্য অসাধারণ।

আংটির উপর কেন যে মেয়েটি নজর পড়ল বুঝতে পারলাম না। হ্যাঁ, নজরে পড়বারই তো কথা। দেখতে খুব সুন্দর। উপরে একটি চারকোণা পাথর। খয়েরি রঙ। দুপাশ দেখতে জালের মতো। মোটা সোনার পাতের উপর বসানো। এই পাতের ভেতর রয়েছে মহাপুরুষের দেওয়া মৃত্যুঞ্জয় কবচ। পাতের নিচে আমার নাম খোদাই করা।

এ-আংটি কি হাতছাড়া করা যায়? তাই বললাম, 'দেখ, তুমি ভুল করছ। আমাকে পাঁচ টাকার নোটই দিয়েছ। একশ টাকা নোট নিশ্চয়ই তোমার ব্যাগের ভিতর। একবার খুঁজে দেখ-না।'

মেয়েটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। গেলাম ভড়কে। বুঝলাম লজ্জা যদি নারীর ভূষণ হয়, অশ্রু হচ্ছে অসি।

চকিতে পাঁচ-ছয় জন চোয়াড়ে চেহারার চ্যাংড়া যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এলো। আমায় ঘিরে দাঁড়াল। তাদের একজন মোটা স্বরে বলল, 'মশাই আংটিটা খুলে দিন।'

ওরা সমর্থন করছে। জোর দিচ্ছে। ঝুটমুট ঝামেলায় পড়া গেল তো। উপকার করতে গিয়ে কী ভুল কাজই-না করে ফেলেছি। তখন কী ছাই কিছু বুঝেছি? আমি তো লাইনে দিব্যি দাঁড়িয়ে ছিলাম একেবারে কাউন্টারের কাছাকাছি। ভিড় অবশ্যি হয়েছিল। তা হবারই তো কথা। জগদ্ধাত্রী পুজো দেখতে কলকাতা থেকে দলে দলে ছেলে-মেয়ে ছুটেছে চন্দননগর। অষ্টমীর দিন হবে।

মেয়েরা কিন্তু অন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিল। সে-লাইনও নেহাৎ ছোট না। মেয়েটি আচমকা এসে পাঁচ টাকার একটি নোট আমার হাতে গুঁজে দিয়ে অনুরোধ করল, 'চন্দননগর যাব। যদি একটা টিকিট কেটে দেন, খুব উপকার হয়।' আমি এড়াতে পারিনি।

এই তার ফল।

খামকা ফাঁপরে পড়ে গেলাম। হাওড়া ইস্টিশনে তখন লোক গমগম করছে। বহুলোক জড়ো হয়েছে। এমন কাণ্ড ঘটবে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন যা পরিস্থিতি, স্বেচ্ছায় না দিলে ওরা জোর করে আংটি ত কেড়ে নেবেই হয়ত-বা চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করবে। বেইজ্জতি। মান বাঁচাতে অগত্যা আঙুল থেকে আংটি খুলে দিলাম।

ভারাক্রান্ত মনে বাড়ি ফিরলাম। কয়েকদিন কেটে গেল। অন্তর্দাহে ভেতরটা চিড়বিড় করতে লাগল। অনিচ্ছায় ভিজিটিং কার্ড দিয়েছিল, সেটা বার করলাম। দেখি, মেয়েটির নাম মীনাক্ষী। কলকাতার ঠিকানাও রয়েছে। এও কি লোক ঠকাবার কৌশল?

একদিন বেরিয়ে পড়লাম। ঠিকানায় পেঁছে কিন্তু ঠোক্কর খেতে হল। মস্ত বড় বাড়ি। সামনে দাঁড়ানো চার-পাঁচ খানা দেশী-বিদেশী মোটর গাড়ি।

নিচে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, ট্রাভলিং এজেন্টের অফিস আর দুটো স্বয়ংক্রিয় লিফট।

এগবো না পেছবো? বড়লোকের ব্যাপার। আমাকেই-না ঠগ সাজতে হয়! আংটি উদ্ধার করতে গেলে ঝুঁকি নিতে হবে। অবশ্যি ঝুঁকি না নিলে এগিয়ে যাওয়া যায় না। দেখি কী ঘটে?

দরোয়ান সংশয়ের দৃষ্টিতে তাকাল। আমি কার্ডটা দেখালাম। দরোয়ান সেলাম ঠুকল। বলল, 'থার্ড ফ্লোর। যাইয়ে।'

লিফটের বোতাম টিপলাম। চারতলায় বারান্দায় পেঁছে গেলাম। বিরাট বড়। আধখানা চাঁদের মতো দেখতে। মোজাইক। চার-পাঁচটা ছোট-বড় সেক্রেটারি টেবিল। পালিশ-করা চকচকে চেয়ার। প্রতি টেবিলের উপর ঠাণ্ডাজলের বোতল আর ছাই দানি। বাংলা-ইংরেজি-হিন্দি খবরের কাগজ, আর টেলিফোন। দেওয়ালে দু'টো-ইলেকট্রনিক ঘড়ি আর পেরেকে ঝোলানো গোটা-কতক রঙ-বেরঙের ক্যালেণ্ডার। বারান্দায় বেসিন, ঠাণ্ডা-গরম জলের ট্যাপ, সাবান-জল-তোয়ালে প্রভৃতি। জানলায় রঙীন পর্দা। কেউ নেই। ফাঁকা।

বসেছিলাম।

দেখি এক রূপসী মহিলা আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কাছে এসে ইংরেজিতে বললেন, 'সুপ্রভাত।'

আমিও উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'সুপ্রভাত।' কার্ডটি তার হাতে দিলাম।

ভদ্রমহিলা চকিতে কার্ডটি দেখে শান্তস্বরে বললেন, 'আসুন'।

অনুসরণ করলাম। একটি বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভদ্রমহিলা দরজা খুলে আহ্বান করলেন, 'আসুন'। তিন-চারটি করিডর ঘুরে তিনি এগিয়ে চললেন। শেষে একটি সুয়িং ডোরের কাছে এসে থামলেন। দরজা ঠেলে ধরে রইলেন। আমি ভেতরে ঢুকলাম। দেখে

নিয়েছি দরজার গায়ে পেতলের প্লেটে ইংরেজিতে লেখা, 'ম্যানেজার'।

ভিতরে শীততাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের গুঞ্জন। বড় মাপের ঘর। সারা ঘর জুড়ে বৈদ্যুতিক আলোর ঝলকানি। মোজাইক-করা ঝকঝকে মেঝে। একপাশে কাঁচঘেরা মাঝারি মাপের ঘর। সেখানে এক ভদ্রলোক ঘূর্ণমান চেয়ারে বসে ফাইল খুলে কী লেখালেখি করছেন। ইনিই তাহলে ম্যানেজারবাবু। তাঁর বাঁ পাশে সেক্রেটারি টেবিলের উপর থাক-করা ফাইলের পাহাড়। ডান দিকে টেলিফোন।

ভদ্রমহিলা সোফার উপর আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে কাঁচঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। টেবিলের উপর কার্ডটি রাখলেন। ম্যানেজারবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী-যেন বললেন। তারপর বাইরে চলে গেলেন।

এদের চালচলন খুব রহস্যময় ঠেকল। সোফায় বসে ম্যানেজারবাবুর উপর দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলাম। বয়েস পঞ্চাশের বেশী না। ছ'ফুট মতো লম্বা হবেন। সুপুরুষ চেহারা। মাথা সাইজে একটু বড়। মধ্যিখানে ইঞ্চি তিনেক লম্বা টাক, কপালের উপর থেকে পিছন পর্যন্ত প্রসারিত। দুপাশে ঘন কাঁচা-পাকা চুল। চকচকে মসৃণ টাকের উপর বৈদ্যুতিক আলোর প্রতিফলন হচ্ছে। জুলফি-জোড়া গালের নিম্নদেশে নেমে এসেছে। লম্বা একজোড়া গোঁফে যেন তাঁর ব্যক্তিত্ব ফুটে বেরুচ্ছে। চোখ দুটো বড় না। মোটা ফ্রেমের চশমা। চোখা নাক। ঠোঁট দুটো অল্প পাতলা। পরণে পুরোদস্তুর স্যুট। মনে হল রাশভারি ও গম্ভীর প্রকৃতি।

এবার ঘরের চারদিকে তাকাতে গিয়ে আমার দৃষ্টি স্থির। দেখি, স্ট্যাণ্ডের উপর একটা রঙীন ফটোগ্রাফ। সৌন্দর্যের রাণী? হ্যাঁ তাইতো। চাতুর্যের রাণীও বটে। চোখের কোণে দুষ্টুমি হাসির ঝিলিক তুলে কী আমায় উপহাস করছে? অন্ততঃ এখন তাই মনে হচ্ছে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। রহস্য খানিক স্বচ্ছ হলো বটে।

দেয়ালে টাঙানো রয়েছে বড় সাইজের অনেকগুলো বাঁধানো আলোক-চিত্র। বিভিন্ন কলকারখানার বলেই মনে হল। ছবির নিচে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে—দিল্লি, আগ্রা, জয়পুর, কলকাতা, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি।

হঠাৎ টেলিফোনের ঝন্‌ঝনানি। ম্যানেজারবাবু রিসিভার তুলে ঘাড় কাত করে বলতে শুরু করলেন, 'হ্যালো...আচ্ছা...আচ্ছা। কী? ধর্মঘট!' সহসা হাসির আওয়াজ। 'নেতাকে মোটা টাকা দিয়ে দাও।

হো হো…। ঠিক আছে।' রিসিভার নামিয়ে দিলেন।

এতক্ষণ পরে বোধ হয় ম্যানেজারবাবুর সময় হল। পেপার ওয়েট ঈষৎ হেলিয়ে কার্ডটি দেখে নিলেন। মুহূর্তে মুখের চেহারা পাল্টে গেল। তাঁর দীপ্ত চোখের সন্ধানী দৃষ্টি আমার উপর। মনে হল এক নজরে আমার ভেতরটা দেখে নিলেন।

ম্যানেজারবাবু কাছে এসে বললেন, 'নমস্তে'। আমি প্রতি-নমস্কার জানালাম।

'কিছু মনে করবেন না। আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। লজ্জিত।'

আমি বলি, 'না না। বরং আমি লজ্জিত। আপনার অমূল্য সময় কেড়ে নিচ্ছি।'

'বলুন, আপনার জন্যে কী কবতে পারি?'

বলি, 'মীনাক্ষীর সঙ্গে দেখা করব। একটু দরকার আছে।'

ম্যানেজারবাবু চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে ধীর গলায় বললেন, 'দিদিমণির সঙ্গে তো দেখা হবে না।'

'কবে দেখা হবে?'

'তাও বলতে পারছি না। আজ সকালের ফ্লাইটে লণ্ডন গেছেন। ওখানে একটা মেন্টাল অ্যাসাইলামে ভর্তি হবেন।'

জিগোস করি, 'উনি কী কোন মানসিক…?'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ম্যানেজারবাবু বললেন, 'ডাক্তার-বাবুরা তাই তো বলেন।' খানিক চুপ করে বলতে শুরু করলেন, 'আমার মনিব একজন বিখ্যাত শিল্পপতি। তাঁর বহু ইণ্ডাস্ট্রি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে আছে। রসায়ন ধাতু, ইঞ্জিনীয়ারিং, বৈজ্ঞানিক ও বয়ন শিল্প। এখানে সেলাই-মেশিন, ট্রাক, ট্রাক্টর, মোটর গাড়ি আর চটের থলে থেকে আরম্ভ করে দামী দামী কাপড়-জামা প্রভৃতি তৈরী হয়। কোটি কোটি টাকার লেনদেন।' একটু দম নিয়ে আবার: 'এ-বাড়িতে এম. এল. এ., এম. পি. থেকে দেশ-বিদেশের মন্ত্রীরা এসে খানাপিনা করেন। তবে দুঃখের কথা কী জানেন, স্যার?'—বলে তিনি আমার দিকে তাকান।

আমি চুপ করে শুনছিলাম।

তিনি বললেন, 'মালিকের অবর্তমানে এ-সব দেখবে কে? সবেধন নীলমণি একটিমাত্র সন্তান, ঐ আমাদের দিদিমণি।' থেমে গেলেন।

বললেন, 'আপনি একটু কফি খান। অনেকক্ষণ এসেছেন।'

বলে টেবিলের তলায় বোতাপ টিপলেন।

একটি নেপালী ছোকরা টগবগ করে ঘরে ঢুকল। লম্বা সেলাম ঠুকল। তার মাথায় ছাই-রঙের টুপি। পরণে খাকী জামা ও হাফ প্যান্ট।

'দু'কাপ কফি, জলদি।'

টেলিফোনটা আবার বেজে উঠল।

কফি খেতে খেতে বললাম, 'দিদিমণি একটা আংটি দেবেন বলেছিলেন।'

'অহো। বুঝেছি। আপনার আংটি। ফেরত নিতে এসেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, কতকটা সেই রকমই বটে।'

'দেখলেন তো দিদিমণির বুদ্ধির দৌড়টা। কী রকম অদ্ভুত কৌশলে তা'-বড় তা'-বড় লোককে বোকা বানিয়ে ছাড়ছেন। তামাম দুনিয়ায় এঁনার জুড়ি মেলা ভার।' মজা করে কথাগুলো বলে ম্যানেজারবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। ফের বলতে শুরু করলেন, 'এই তো সেদিন মন্ত্রীর এক পি.এ-কে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন। অবশ্যি বেশী না। হাজার দশেক টাকা। ভদ্রলোক এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই টাকা ফেরৎ দিয়েছি। মাত্র দিন কুড়ি আগে এক হীরের ব্যবসাদার দিদিমণির বুদ্ধির তারিফ করে গেল। প্রমাণ নিয়ে তাঁকে এক সেট হীরের গহনা ফেরৎ দিলাম।'

ম্যানেজারবাবুর কথায় মুরুব্বির ভাব দেখে বুঝলাম, মোসাহেব হবার আদবকায়দাগুলো তিনি বেশ রপ্ত করে ফেলেছেন। চুপ করে তাঁর কথা শুনছিলাম। তিনি বলছিলেন, 'জানিনা দিদিমণি কি জাদু জানেন। আর ডাক্তাররা বলেন কিনা মানসিক রোগ! তবে এখানকার কোন ডাক্তার একথা বলতে সাহস পায় নি। বলছে ঐ সায়েব ডাক্তারগুলো। দেখা যাক জল কোন্‌দিকে গড়ায়?'

কাপে শেষ চুমুক দিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করেন, 'তবে কী জানেন স্যার? এটা অবশ্যি আমারও আশ্চর্য ঠেকে।'

আমি উৎসুক হয়ে জিগ্যেস করি; 'কী বলুন তো?'

'এই-যে লোককে বোকা বানানো বা ঠকানো, যাই বলুন-না কেন, এসব ঘটনার কথা পরে আর দিদিমণির মোটেই মনে থাকে না। টাকা-পয়সা, সোনা-দানা সবই আমার কাছে জমা দেন। কোত্থেকে কীভাবে নিয়ে

এলেন, জিগ্যেস করলে কিছুই বলতে পারেন না।'

আবার ফোন বেজে ওঠে। ম্যানেজারবাবু সংক্ষেপে কথাবার্তা সেরে নিলেন। তিনি বলতে শুরু করেন, 'কথা কী জানেন? উদ্দেশ্য খারাপ না। তা যদি হবে, দিদিমণি নিজের পরিচয়পত্রই-বা দেবেন কেন? আর আমরাই-বা জিনিস ফেরৎ দেব কেন? তাছাড়া এঁনাদের অভাব কী বলুন? যিনি কোটি কোটি টাকার মালিক তিনি অপরকে ঠকিয়ে রোজগার করতে যাবেন কেন? আসলে লোককে বোকা বানিয়ে আনন্দ উপভোগ করাই হল উদ্দেশ্য। আর এটাই তাঁর অসুখ। অবশ্যি বিলেতী ডাক্তারদের মতে।'

মনে পড়ল, এক সায়েব-ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন, 'মৃগী আক্রমণের অব্যবহিত পরে রোগী নানাপ্রকার অস্বাভাবিক কাজ করে। একে বলে, পোস্ট এপিলেপ্‌টিক অটোমেটিজ্‌ম। এটা হয় সাধারণতঃ টেম্‌পোরেল লোব এপিলেপসিতে।' এ ধরণের কোন রোগ নয় তো?

'আচ্ছা এ রোগের কারণ কী? সায়েব-ডাক্তার কী কিছু বলেছেন?'

ম্যানেজারবাবু চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলেন। তারপর শান্ত স্বরে বলতে শুরু করলেন, 'আবছা আবছা মনে পড়ছে। এসব প্রতারণার পেছনে কোনও 'মোটিভ' নেই· অর্থাৎ বিশেষ কোনও প্রাপ্তির আশা নেই। এ-শ্রেণীর লোক পাগল-টাগল বা নেশাখোরও না। সাধারণ প্রতারকের সঙ্গে এইখানে তফাৎ। ডাক্তারবাবুরা মনো-বিজ্ঞানের আলোয় এদের বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। তাঁদেব মতে এ-ধরণের প্রতারণা নাকি একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা, মানসিক সুখ-উপলব্ধি বা তৃপ্তিবোধ করা। প্রতারণার কাজে সাফল্যলাভের পর এই মানসিক তৃপ্তিব শিহরণ নাড়া দেয় তাদের দেহ-মনকে। কাজটা যে অন্যায়, এ তারা ভালরকমই বোঝে। তবু প্রতারণা না করলে কেমন যেন অস্বস্তি। নেশাখোরের মতো আর-কি। অনেকক্ষণ পরে নেশার বস্তু পেলে যেমন তার তৃপ্তি হয়, তেমনি। এই মানসিক টানা-পোড়েন আসে কোথা থেকে? সে কথা জানতে হলে তার শৈশব জীবনে ফিরে যেতে হবে। তবে অন্য লোকের বেলায় কী ঘটে বলতে পারব না। দিদিমণির শৈশবে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার উপর ভিত্তি করেই ডাক্তারবাবুদের এই সিদ্ধান্ত। এবার ঘটনার কথা বলি :

'তখন দিদিমণি পঞ্চম কী ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী। একদিন ক্লাশের মধ্যে তার এক সহপাঠিনীর সোনার হার চুরি হয়। হারটা এমন কিছু দামী না। সে টিফিনের সময় হারটা বই-রাখা ব্যাগের মধ্যে রেখে বাইরে খেলা করছিল।

টিফিনের পর ক্লাসে ফিরে এসে দেখে ব্যাগ থেকে হারটা উধাও।

সঙ্গে সঙ্গে প্রধান শিক্ষিকার কাছে নালিশ। ক্লাসের সব ছাত্রীর ব্যাগ খুলে পরীক্ষা করা হল। দিদিমণির ব্যাগ হাতড়ে পাওয়া গেল সোনালীর হার। অবাক কাণ্ড! বড়লোকের মেয়ের এ কী কাজ! ব্যস, ইস্কুলের মধ্যে হৈ-চৈ। প্রধান শিক্ষিকা দিদিমণিকে যাচ্ছেতাই বকুনি দিলেন। দিদিমণি কিন্তু এ ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গ জানত না। দৃঢ় প্রতিবাদও করেছিল। কে কার কথা শোনে? সহপাঠিনীরা তার জামায় লাল কালিতে 'চোর' লিখে খুব ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। কটুবাক্যের তীব্র হুল ফোটানো বন্ধুদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণে দিদিমণি কয়েকদিন প্রচণ্ড জ্বরে শয্যাশায়ী হয়। অবশ্যি পরে পুলিশী তদন্তে প্রকাশ পায়. সোনালী নিজেই সকলের অজান্তে দিদিমণির ব্যাগের ভিতর হার লুকিয়ে রেখেছিল তাকে হেনস্তা করবার জন্য। সোনালী নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারেব মেয়ে। তার বাবার ছিল মাস-মাইনের চাকরি। আর আমাদের দিদিমণি?— ধন-কুবেরের একমাত্র সন্তান। সাধারণের চোখে ঈর্ষার পাত্রী। সোনালী হীনমন্যতায় (ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স) ভুগত। তাব ছিল দিদিমণির উপর চাপা আক্রোশ। ব্যক্তিগত ঈর্ষা চরিতার্থ করবার জন্য সোনালীর এই জঘন্য প্রয়াস।'

খানিক থেমে ম্যানেজারবাবু বর্তমান প্রসঙ্গে চলে আসেন:

'সায়েব-ডাক্তাররা এই ঘটনা বিশ্লেষণ করে বলেছেন. 'এ-রকম ঘটনায় শিশুর মানস-মণ্ডল পর্যুদস্ত হয়। মনের গভীরে হয় বিদ্বেষ, ঘৃণা ও প্রতিহিংসার প্রথম বীজরোপণ। ফলে শৈশবের সুকুমার মন পঙ্গু হয়ে পড়ে। মনের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে না। ক্ষোভ, ঘৃণা, ক্রোধ, আবেগ ইত্যাদি বন্দী থাকে শিশুর অবচেতন মনে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো সৃষ্টি করে একপ্রকার মানসিক জটিলতা। এই মানসিক জটিলতার ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে মানুষ হয় বিকৃত-মস্তিষ্ক, খুনী, প্রতারক বা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। আবার কেউ কেউ আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়। খুনী বা প্রতারকের ঘৃণ্য মনোবৃত্তি একদিক থেকে সমাজের প্রতি তাদের বিক্ষোভ প্রকাশ। এ-সব খুনী বা প্রতারকের মনের গভীরে একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা থাকে। সেটা হচ্ছে, এই মানসিক চাপ বা 'টেনশন' থেকে মুক্তি বা সাময়িক সুখানুভূতি। তাই মানুষ একটার পর একটা খুন বা প্রতারণা করে। শেষে সে এমনই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে বেশীদিন এ-কাজ না করলে মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করে। মজার ব্যাপার হল, এ-রকম নেশাগ্রস্ত অবস্থায় মস্তিষ্কের অন্যান্য কার্যের কোন

বিপর্যয় ঘটে না। সামাজিক সচেতনতা ও বুদ্ধি পুরো মাত্রায় বজায় থাকে। মানুষ ঠাণ্ডা মাথায় রীতিমত পরিকল্পনা করে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

ম্যানেজারবাবু দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার বুঝতে নিশ্চয়ই আপনার অসুবিধে হচ্ছে না। দিদিমণির এ কাজ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়।'

ম্যানেজারবাবু সিগারেট ধরালেন। বললেন, 'আচ্ছা আংটিটা আপনার কবে খোয়া যায়? তারিখ কী মনে আছে?'

আমি বলি, 'জগদ্ধাত্রী পুজোর অষ্টমীর দিন। নভেম্বরের সাত-আট তারিখ হবে।'

ম্যানেজারবাবু সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ছাইদানির উপর রেখে দিলেন। ফাইল বার করলেন। পাতা উলটাতে উলটাতে এক জায়গায় থামলেন। ঠোঁট দু'টো চেপে কী যেন ভাবলেন। চোখের তারা ঘুরিয়ে আমাকে একবার দেখে নিলেন। চিন্তিতমুখে বললেন, 'হ্যাঁ, আট তারিখ সন্ধ্যে আটটায় একটা আংটি পাওয়া গেছে।' তারপর জিগ্যেস করলেন, 'আংটি যে আপনার, কী করে বুঝবো? কোন প্রমাণ আছে?'

আমি টেবিলের উপর একটু ঝুঁকে পড়লাম। বললাম, 'প্রমাণ যথেষ্ট আছে।'—এই বলে আংটির বিবরণ দিলাম। আমার নাম যে খোদাই করা আছে তাও বললাম।

ম্যানেজারবাবু সিগারেট তুলে নিলেন। ছাই ফেললেন আঙুলের টোকা দিয়ে। বললেন, 'ঠিক আছে। আমাদের বিবরণের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আচ্ছা ওজন কত, বলতে পারেন?'

পড়লাম ফাঁপরে। বিব্রত ভাবে বললাম, 'অনেকদিন আগের গড়া। মনে পড়ছে না।'

আমার কথা শুনে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। 'দেখুন তবে।'—এই বলে ফাইলটা আমার হাতে দিলেন।

বিবরণ দেখে ত আমার চক্ষু স্থির। সব পাকা কাজ। আংটির আলোকচিত্র কাগজের সঙ্গে আঁটা। বিবরণ নিখুঁত। ওজন এমন-কি এখনকার বাজারদর পর্যন্ত লেখা। ফাইল ফেরৎ দিলাম।

ম্যানেজারবাবু সিগারেটের শেষ অংশ ছাইদানির মধ্যে ফেলে দিলেন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'দেখুন, আমি দুঃখিত। খুবই লজ্জিত। এটা এখনই আপনাকে ফেরৎ দিতে পারছি না।'

আমি চুপ করে রইলাম।

ম্যানেজারবাবু নরম গলায় বললেন, 'দেখুন, আমাদেরই গাফিলতি। প্রায় লাখ টাকার গহনা-সমেত ওই আংটি চুরি গেছে আজ আটদিন হল। এই দেখুন; উল্টোপাতায় তারিখ লেখা রয়েছে।'—এই বলে তিনি ফাইলটা আবার আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

আমি হতাশ স্বরে বললাম, 'না না ফাইল দেখবার কী আছে? বলছেন যখন চুরি গেছে, তখন আর কী করা যায়।'

ম্যানেজারবাবু আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে বললেন, 'চিন্তিত হবেন না, স্যার। চোর আসলে দিদিমণির চাকর। চুরি করে সে বাড়ি পালায়। বাড়ি বালেশ্বর জেলায়। বামাল-সমেত ধরা পড়েছে। তবে দুঃখের কথা কী জানেন, আপনার আংটিটা পাওয়া যায়নি।'

'তাহলে কি আর পাওয়া যাবে না।'

ম্যানেজারবাবু চোখজোড়া বড়ো বড়ো করে বললেন, 'কী যে বলেন স্যার! বেঁচে থাক আমাদের দেশের পুলিশতন্ত্র। থার্ড ডিগ্রী মন্ত্রেরমন্ত্র জোর কম না। চাকরটা দোষ স্বীকার করেছে। সে তার শ্যালকের কাছে আংটিটা পাচার করেছিল। শ্যালকও ধরা পড়েছে। সে এখন খড়্গপুর হাসপাতালে ভর্তি আছে। গুরুতর আহত। সে পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করেছে। আংটি প'রে সে ট্রেনে কলকাতায় আসছিল। ট্রেনে ডাকাত পড়ে। মারধর করে আংটিটা তারা কেড়ে নিয়েছে।' ম্যানেজারবাবু থেমে আবার একটা সিগারেট ধরান।

আষাঢ়ে গল্প মনে হল। মন ভেঙে যায়। চুপ করে থাকি।

ম্যানেজারবাবু বললেন, 'হতাশ হবেন না। তদন্ত চলছে। পুলিশের চোখে ধুলো-দেওয়া অত সোজা নয়। ডাকাত ধরা পড়বেই। পরে ভদ্রতা করে বললেন, 'কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলব।'

আমি বলি, 'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!'

ম্যানেজারবাবু কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে নিলেন। বললেন, 'যদি এর দাম নিতে চান, এখনি নগদ টাকা দিতে পারি। আর যদি আংটি চান গড়িয়ে দেব।'

আমি তখন বিরক্ত ও হতাশ স্বরে বললুম, 'না না ব্যস্ত হবেন না। পুলিশের হাতে যখন কেসটা গেছে···। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী ঘটে।'

ম্যানেজারবাবু বললেন, 'তাহলে আমার বলার কিছু নেই। আপনার

ফোন নম্বর দিয়ে যান। আংটি পেলে আপনাকে জানাব।'

'ঠিক আছে। লিখে রাখুন।' ফোন নম্বরটা দিয়ে বলি, 'এবার ওঠা যাক। নমস্কার।'

ম্যানেজারবাবু প্রতি-নমস্কার করে কলিং বেলের বোতাম টিপলেন। বাহাদুর এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

'সাবকো লে যাও।'

বাহাদুর দরজা ঠেলে বাইরে পা বাড়াল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

ইস্! আর একটু হলে ধাক্কা লেগে যেত। সামলে নিলাম। কার্ড-হাতে সেই মেয়েটির উষ্ণ নিঃশ্বাসে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। নিবিড় একজোড়া চোখ। ভোলা যায় কি? আশ্চর্য! সে মুহূর্তে সরে গেল। সঙ্গে সুট-টাই-পরা এক ভদ্রলোক।

বাহাদুর আমাকে লিফ্‌টে তুলে দিয়ে সেলাম ঠুকল। বোতাম টিপলাম। নেমে এলাম নীচে। রাস্তায়।

*

বেশ দুশ্চিন্তায় কাটল প্রায় একমাস।

একদিন সন্ধ্যের পর একা চেম্বারে বসে আছি। জানুয়ারি মাস হবে। শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। এক টগবগে তরুণ হন্তদন্ত হয়ে চেম্বারে ঢুকল। আগে তাকে দেখেছি বলে মনে হল না। হাত তুলে নমস্কার করে সে সামনে দাঁড়াল। আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। বয়েস তেইশ-চব্বিশ হবে। একমাথা চুল। উসকো খুসকো। মুখ ভর্তি গোঁফ-দাড়ি। পরণে পাজামা। গায়ে ফুলহাতা সোয়েটার। পায়ে চপ্পল। ছিপছিপে চেহারা। লম্বাটে। চোখে কালো গগলস। বেপরোয়া ভাব।

সে বলল, 'ডাক্তারবাবু, আপনাকে এখনই আমার সঙ্গে যেতে হবে। ডাঃ হক গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ছেলের অসুখ।'

ডাঃ হক থাকেন বাঁশবেড়ে। এ অঞ্চলের নাম-করা ধাত্রী-বিদ্যা বিশেষজ্ঞ। তাঁর ছেলের অসুখ। যেতে হবে বৈকি।

বাইরে এসে দেখতে পেলাম, কালো রঙের অ্যামব্যাসেডর। সামনের কাঁচে ছোট ক্রশ চিহ্ন। গাড়িটা নিঃসন্দেহে ডাক্তারের। ডাঃ হকের কি? তাঁর গাড়ি কোনদিন দেখিনি। নম্বরও জানি না।

তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। রাস্তার ধারে তফাতে তফাতে ইলেকট্রিকের খুঁটিগুলো খাড়া দাঁড়িয়ে। গাড়ি খাম্বিনায় এসে মোড় ঘুরল।

জি, টি, রোড ধরে সোজা উত্তর দিকে ছুটতে লাগল। জীবন পালের বাগান পার হলাম। রেল ব্রীজও পার হলাম বেশ মনে আছে। এখানটা নির্জন। দোকান-টোকান নেই বললেই হয়। দুধারে ঝোপ-ঝাড়। খেঁজুর গাছ। গাড়িটা হঠাৎ ব্রেক কষল। আমি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়লাম।

আচম্বিতে গোটা-চারেক হোঁৎকা চেহারার ছোকরা গাড়িটা ঘিরে দাঁড়াল। প্রত্যেকের হাতে ছোরা। কালো মুখোশ-পরা। মনে হল ওরা ওৎ পেতে বসেছিল। আর চালক? নিশ্চয়ই এদেরই একজন। না-হলে ব্রেক কষবে কেন?

চোঙা প্যান্ট-পরা ছেলেগুলো আচমকা হুড়মুড় করে গাড়িতে উঠে পড়ল। আমি প্রতিরোধ করবার সুযোগ পেলাম না। তারা জোর করে আমার হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। এক ফালি কাপড় দিয়ে মুখ-চোখ বেশ টাইট করে বাঁধল। তারপর গাড়ি ছুটে চলল।

আমি যেমন হতভম্ব তেমনি উদ্বিগ্ন। ভয়ে আমার শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল। নানা রকম চিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এদের মতলবটাই-বা কী? খুন? মুক্তিপণ? কেন?

কতক্ষণ বসে আছি জানি না। সহসা গাড়ি গেল থেমে। মন সংশয় ও আতঙ্কের দোলায় ঘুরপাক খেতে লাগল। কানে ঢুকল জম্বুকের ডাক, হুক্কাহুয়া। বুঝলাম কোন জঙ্গলা জায়গায় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তারপর শুনতে পেলাম রেলগাড়ির হুস হুস। মোটর আবার চলতে শুরু করল। বুঝলাম কোন লেভেল ক্রশিং পার হচ্ছি।

অনেকক্ষণ একভাবে ছোটার পর মনে হল গাড়ির গতিবেগ এবার কিছুটা কমে এসেছে। আমার ঘাড় আর হাত দুটো অসম্ভব টনটন করছে। কোমরে পুরনো ব্যথা আবার চাগাড় দিয়ে উঠেছে। হঠাৎ হেঁচকা মেরে গাড়ি থেমে গেল। হাতের নড়া ধরে আমাকে নামান হল। বাইরে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। ওরে বাবা! একী ব্যাপার? আমায় চেং-দোলা করে কোথা নিয়ে যাচ্ছে? কিছুই তো বুঝে উঠতে পারছি-না। আমি তখন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ও অবসন্ন। জিজ্ঞাসা করেও কোন উত্তর পাইনি।

এতক্ষণ ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত-শীত করছিল। হঠাৎ গরম বোধ হল। আমার মাথাটা নিচু আর ঠ্যাং দু'টো উঁচু দিকে। ঘন ঘন দুমদুম ধুপধাপ আওয়াজ। বুঝলাম সিঁড়ি বেয়ে আমাকে ওঠানো হচ্ছে। দম বন্ধ হবার

উপক্রম। ডান হাতের কব্জিতে ঠোক্কর খেলাম। জ্বালা করে উঠল। হড়কে পড়ে যাচ্ছিলাম। ওরা জাপটে ধরল। মাথার দিকটা একটু উঁচু করল।

আবার ধাক্কা খেলাম। এবার বাঁ কনুইয়ে। ঝনঝন করে উঠল। বাপরে বাপ। আচ্ছা ঠ্যাঙাড়ের পাল্লায় পড়লাম বটে। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছিলেন আনন্দের অবতার। সবদা আনন্দ সাগরে ভাসতেন। আর আমরা? দুঃখের অবতার। চোখের জলে সাঁতার কাটছি। হাওয়া এখন কোন্দিকে? বাঙালি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। শীতের রাতে চোখের জলে নাকের জলে চুবানি। দেহের রক্ত কী জল হয়ে লোমকূপের সরু পথ বেয়ে চোয়ানি মারছে?

এবার খটখট আওয়াজ কানে এল। আমাকে ধপাস করে বসিয়ে দিল। মুখ-চোখের বাঁধন খুলল। চোখের পাতা খুলতে কষ্ট হচ্ছে। সহসা বৈদ্যুতিক আলোর ঝলকানি। মাথা গেল ঘুরে। একটু হলে চিৎপটাং। ওরা ধরে ফেলল। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিল। মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল। সিলিং ফ্যানের সোঁ সোঁ শব্দ। একটু আরাম বোধ হল।

ধীরে ধীরে চোখের পাতা খুলে দেখি আমায় ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সাত-আট জন ছোকরা। জোয়ান তাগড়া চেহারা। হিপি চুল। মুখোশ আঁটা। ফুলহাতা সোয়েটার। চোঙা প্যান্ট। সাদা কেডস্। কোমরে রিভলবার আর হাতে ছোরা।

বুক গুরগুর করে উঠল। নাড়ি রেসের ঘোড়ার মতো ছুটছে। ব্যাপার স্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। খুনের ইচ্ছা থাকলে একটা গুলিই তো যথেষ্ট। এদের কী অন্য মতলব আছে? কী সেটা? ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ। ক্ষীণ স্বরে বললাম. 'একটু জল।'

জল এনে দিল। পান করে স্বস্তি পেলাম।

চারদিক তাকালাম। বেশ বড় মাপের ঘর। গোটা দুই টিউব-লাইট জ্বলছে। সিমেন্টের মেঝে। চিড় খাওয়া। দুপাশে বড় বড় জানলা। খড়খড়ি লাগানো। অনেক দিন রঙের মুখ দেখেনি। দেওয়ালের কোনো কোনো জায়গায় পলেস্তারা খসে পড়েছে। ইট উঁকি মারছে। ছাদ পেটাই করা কী? হ্যাঁ তাই হবে। কাঠের কড়ি-বরগা দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা কড়ি আবার উই-ধরা। মান্ধাতা অমলের বাড়ি আর কি! বহুদিন রাজমিস্ত্রীর হাত পড়েনি।

সর্দার শাগরেদের সঙ্গে ঠারে ঠারে কী-যেন পরামর্শ করে নিল, বুঝতে

পারলাম না। তারপর হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকল। আমি সর্দারের পিছু পিছু যেতে লাগলাম। আমার পিছনে টর্চ হাতে জনা-তিনেক ছোকরা। বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে নাকি?

সর্দার একটা বন্ধঘরের সামনে এসে থামল। এখানে আবছা অন্ধকার। সে দরজার পাল্লায় সংকেত মূলক টোকা দিল। দরজা খুলে গেল। সেকেলের দরজা। হাঁসকল লাগানো। ভেতর থেকে আলোর ফোকাশ বাইরে পড়তেই একটা জন্তুর অক্ষিগোলক জলে উঠল। একটু সরে দাঁড়ালাম। অ্যালসেশিয়ান কুকুর। বেশ বড়, বলশালী এবং বলিষ্ঠ।

ভেতরে ঢুকলাম। এক তাগড়া জোয়ান তক্তপোষের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে। মুখে অবশ্যি যথারীতি মুখোশ-আঁটা। ছটফট করছে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ডান হাতে কব্জির উপর দিকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। রক্তে ভেজা। বিছানার পাতলা চাদর এমন-কি মাথার বালিশের ওয়াড়ে তাজা রক্তের ছোপ।

খাটের সামনে উঁচু টেবিল। টেবিলের উপরে ছুরি, কাঁচি, সেলাই-সূচ ইত্যাদি ডাক্তারি যন্ত্রপাতি পরিষ্কার ট্রেতে সাজানো।

আমাকে পাকড়ানোর উদ্দেশ্য এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে নিলাম। তবুও টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। হ্যাঁ সব ঠিক আছে। এ-কেসে যা যা দরকার সবই মজুত। এমন-কি সাবান, জল, বালতি, তোয়ালে ইত্যাদি টুকিটাকি জিনিসও। সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা।

নির্দেশের অপেক্ষায় না থেকে, করণীয় কর্তব্য বুঝে কাজে নামলাম। সাবান-হাত করলাম। সঙ্গে সঙ্গে এক ছোকরা হাতে জল ঢেলে দিল। তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে চোখ আটকে গেল দেয়ালে-টাঙানো বাঁধানো এক বিশাল ছবিতে। ছবিটা যে ভারতের স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট নকশাল-নেতা 'চারু মজুমদারের, বুঝতে দেরী হল না। বিস্ময়ের চমক খেলাম।

প্রথমে রক্তভেজা ব্যাণ্ডেজ সাবধানে খুলে ক্ষতস্থান পরীক্ষা করলাম। ক্ষত তত গভীর না। কোন ধারাল অস্ত্রের আঘাত। অল্প অল্প রক্ত চোঁয়াচ্ছে। একজন হাতটা জোর করে টিপে ধরল। তাড়াতাড়ি সেলাই দিলাম। ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম। ইনজেকশান যা দরকার, দিলাম। টেবিলের উপর রাখা কাগজে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলাম। ব্যস

আমার কর্তব্য শেষ। এবার ওদের দিকে তাকালাম। মনে হল ওরা খুশি।

একটু পরে এক কাপ চা এলো। একজন বাড়িয়ে দিল সিগারেট। দুটোরই প্রয়োজন ছিল। চা শেষ করে সিগারেট ধরলাম। দারুণ টেস্ট। এ জাতীয় সিগারেট কখনও খাইনি। বেশ আমেজী। তন্দ্রা আসছিল। ঘুম ঘুম পাচ্ছিল।

*

ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ। কুকুরটা ডাকছে কেন? মাথা তোলবার চেষ্টা করলাম। বড্ড ভারি বোধ হল। ঠক্ করে ঠুকে গেল। ঝিন্‌ঝিন্ করে উঠল। ঘাড় কাত করি। একী! এ-যে দেখছি আমারই ডাক্তারি ব্যাগ। কী আশ্চর্য! ব্যাগের উপর মাথা রেখেই শুয়ে আছি? ওটা তো গাড়িতে ছিল, বেশ মনে আছে। এখানে এলো কি করে? বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। আমি তো দিব্যি ঘরের মধ্যে ছিলাম। জানলাগুলো বন্ধ। তবে? মাথার ভেতর শিরাগুলো কেন টন টন করে উঠল? চোখ দু'টো রগড়ে নিলাম। একী! ঘাসের উপর শুয়ে আছি কেন? জামা-প্যান্ট শিশির-ভেজা। আবার ঘেউ-ঘেউ। আমি উঠে বসলাম।

চারপাশ চোখ বুলিয়ে নিলাম। অবাক কাণ্ড। অ্যালসেশিয়ান গেল কোথা? এ-যে দেখি দুটো দেশী কুকুর। যে ঘরে বসেছিলাম, সেই ঘরটাই-বা গেল কোথা? মাথার উপর অসংখ্য তারকাখচিত নীল আকাশ। বসে আছি তো ফাঁকা মাঠে। সামনে সারি সারি ইলেকট্রিক খুঁটিতে আলোর ইশারা। কী ব্যাপার? একটা ট্রাক হর্ণ বাজাতে বাজাতে চলে গেল। তাহলে ওখানে কী রাস্তা? ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। ঘুমের ঘোর তখনও কাটেনি। নেশাগ্রস্তের মতো টলতে টলতে এগিয়ে গেলাম। হ্যাঁ রাস্তাই বটে। পিচঢালা। ছেলেগুলো কী জাদু জানে? এখানে কখন্ ছেড়ে দিয়ে গেল বুঝতে পারিনি। জায়গাটা চেনাচেনা মনে হচ্ছে। ঐ তো রাস্তার ধারে কি-একটা ঘরের মতো দেখতে পাচ্ছি। পা পা করে এগিয়ে গেলাম। তাজ্জব ব্যাপার! এ-যে দেখছি আমাদের বীণাপাণি লাইব্রেরি! ঠিক দেখছি তো? ঠিকই বটে। লাইব্রেরির সামনে জলের কল।

তবে তো এসেই পড়েছি। লাইব্রেরির গা ঘেঁসে দু'পা গেলেই তো আমার বাড়ি। ●

এত সহজে মুক্তি পাব আশা করিনি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। তবে শরীরের যা অবস্থা। হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। কাঁটায়কাঁটায় বারোটা। উঃ ছ-সাত ঘন্টার শাস্তিভোগ। মানি ব্যাগটা? পকেট হাতড়ে বের করলাম। না, কিছু নেয়নি। তাড়াতাড়ি ডাক্তারি ব্যাগটা খুলে ফেললাম। সব ঠিক ঠাক। একী! নীল কাগজের একটা মোড়ক কেন? ওটা তো ছিল না। কোত্থেকে এলো? মোড়ক খুলে ফেললাম। সোনার আংটি। চমকে উঠলাম। আমার ফিস? ছেলেগুলো ত দেখছি খুব ভদ্র। উলটে-পালটে আংটিটা পরীক্ষা করলাম। অবাক কাণ্ড! এ-যে আমারই নামাঙ্কিত সেই-ই আংটি। আমার হারানিধি। ওরা পেল কি করে?

আশ্চর্য!

সাত

অনুসন্ধান

'ছেলে পাঁচ বছরে পা দিয়েছে, ডাক্তারবাবু! দেখছেন তো, একদম বাড় নেই। কী রকম হলদে হয়ে গেছে। সর্দি-কাশি-জ্বর লেগেই আছে।' —বলে সরলা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমি জিগোস করলুম, 'কেন? ডাক্তার-বদ্যি করিস নি?'

'শহরের বড় বড ডাক্তাব দেখেছে। কেউ সারাতে পারছে না। ঠাকুর-দেবতা-রোজা-মাদুলি-তাবিজ কিছুই বাকি রাখিনি।' ধরা গলায় সরলা জবাব দিল।

ছেলেটিকে বেডে শোয়ান হল। রোগা। মাথা বড়। পেটটা ডাগর। পরীক্ষা করে বুঝলুম, থ্যালাসিমীয়া। প্রচণ্ড রক্তহীনতা। দুরারোগ্য ব্যাধি। সাময়িক উপশমের জন্য ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে আচমকা প্রশ্ন করলাম, 'হ্যাঁরে ছেলেটা কার?'

সরলা যেন থতমত খেয়ে যায়। 'কেন? আমার।'

আবার জিগোস করলুম, 'ওঃ, পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছিস বুঝি?'

সরলা কোন অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাল কপালে হাত ঠেকিয়ে। 'পুষ্যি নেব কেন? বাবার দয়া। বাবার থানে হত্যে দিয়েছিলুম। বাস ওষুধ পেয়ে গেলাম। বছর না ঘুরতেই এই ছেলে।' সরলা বেশ শান্ত গলায় উত্তর দিল।

আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম। বললুম, 'তাই নাকি!'

সরলা বলল, 'তবে কী বলছি ডাক্তারবাবু? আপনিই তো বলেছিলেন ছেলে-পুলে হবে না। তোর সোয়ামির দোষ। উঃ সেই নিয়ে কী অশান্তি!'

'কেন? তোর সোয়ামিকে ভাল করে পরীক্ষা করেই তো এ-কথা বলেছিলুম। এতে অশান্তি হবার কী আছে?'

মনে পড়ল, একবার না, তিন-তিনবার ওর স্বামীর শুক্র পরীক্ষা করা হয়েছে। কলকাতার নাম-করা প্যাথলজিস্টের রিপোর্ট, শুক্রে বীজ (স্পার্ম) একেবারেই নেই।

সরলার মুখ-চোখে সামান্য উত্তেজনা ফুটে উঠল। সে বলতে শুরু করল, 'অত কাণ্ড ঘটবে আমি কী জানতাম ছাই? আপনার কথা শাশুড়ীকে

ভালভাবে বুঝিয়ে বললুম। আর যায় কোথা? বারুদ-ঘরে যেন আগুন লেগে গেল। তিনি আঁচলখানা গাছ-কোমরে বেঁধে ফণা তুলে ফোঁস করে উঠলেন। মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, 'কী বললি? আমার ছেলের দোষ! মুখ ভেঙে দেব, জানিস। পতি-নিন্দে করতে মুখে আটকায় না?'

সরলা একটু দম নিল। বলল, 'আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি বলুন তো। সত্যি কথা বলেছি। এতে কী পতি-নিন্দে হল?'

আমি হেসে বললুম, 'হাজার হোক তোর শাশুড়ী সেকেলের মেয়ে। জ্ঞানগম্যি কম। তাই হয়তো ভুল বুঝেছে।'

সরলা ভ্রু-জোড়া কুঁচকে বলল, 'না ডাক্তারবাবু, ঠিকই বুঝেছে। আসল কথা, শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা। বলে কিনা নিজে বাঁজা, সেটা মানতে বুঝি লজ্জা হচ্ছে? আর তোর ঐ বাপের বাড়ির ডাক্তার! ইস্ ডাক্তার না ছাই! তোর হয়ে গাইবে না তো আমার ছেলের হয়ে গাইবে? কারসাজি সব বুঝি। ঘাস খেয়ে মানুষ হয়নি, বুঝলি?'

সরলা একটু থামে। কপালে এলিয়ে-পড়া চুল সরিয়ে দিয়ে আবার বলতে শুরু করে, 'কী কথা থেকে কী কথা এসে পড়ল। আমি ঝগড়া-ঝাঁটি মোটেই পছন্দ করি না। ডাক্তারবাবু! বিয়ের পর দু'বছর কেটে গেল। ছেলেপুলে হল না দেখে উঠতে-বসতে গঞ্জনা। বাঁজা বলে তো হামেশা খোঁটা দিত। শেষে মা-ছেলে মিলে ঠেঙাতে আরম্ভ করল। সবই মুখ বুজে সহ্যি করেছি।'

'তোর খুব সহ্যশক্তি।'

সরলা বলল, 'হ্যাঁ, তা যা বলেছেন ডাক্তারবাবু। আসলে আমার বাবা গরিব তো। আমাকে মেরে ফেললেও বাবা কিছু করতে পারবে না। ওরা ভালভাবেই জানে।'

আমি জিগ্যেস করলুম, 'আচ্ছা, আমার কাছে চিকিচ্ছে করবার আগে ওরা তোর সোয়ামিকে অন্য ডাক্তার দেখায় নি?'

'কি যে বলেন ডাক্তারবাবু!' সরলা ধিক্কারের স্বরে বেজে উঠল। 'বেটাছেলের যে দোষ থাকতে পারে, ওরা বিশ্বাসই করে না। আমাকে বোতল-বোতল টনিক গিলিয়েছে। শেষে বাঁজা বলে হলাম ওদের চক্ষুশূল। তাই সেদিন সোয়ামির দোষ বলাতে শাশুড়ী গালাগালি আরম্ভ করলেন। আপনাকে ছাড়েনি।'

সরলার চোখে আগুনের ঝলক। সে বলতে শুরু করল, 'আপনার

নিন্দে শুনে আমার মাথা গেল গরম হয়ে। আমি চড়া-গলায় বললুম, চোরের মার বড় গলা। আপনার ছেলের যদি দোষ না থাকবে তবে আগের দু'টো বউ-এর ছেলে হল না কেন? কেন প্রথম-পক্ষের বউ গলায় দড়ি দিল? দ্বিতীয় পক্ষের বউ ঘর করল না, কেন? সব জানি।'

'তোর শাশুড়ী কি জবাব দিল?'

'জবাব কী আছে যে দেবে?' সরলা বলে, 'মুড়ো ঝেঁটা নিয়ে তেড়ে এলো। ভাগ্যিস যণীপিসি এসে পড়েছিলেন। তাই রক্ষে। তিনি ঝেঁটাটা শাশুড়ীর হাত থেকে কেড়ে নিলেন।'

সরলা আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে আবার বলতে শুরু করল, 'শাশুড়ী তখন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে পিসিকে বলতে লাগল, মরাই বেঁধে ভাত খাই। দোতলা বাড়ি হাঁকিয়েছি। এত সম্পত্তি দেখবে কে? মরে গেলে বেয়াই-বেয়ান-বাড়ির লোক এসে সব লুটে-পুটে খাবে। তা হতে দেব না।'

'তখন পিসি তামাশা করে বললেন, বটেই ত বউদি। তোমার বেয়ান বাড়ির লোক পঙ্গপালের মতো উড়ে এসে জুড়ে বসবে, তা কি হয়?'

'শাশুড়ীর গলায় হাহাকার স্বর ফুটে উঠল। বললে, হাটুরে ঘর থেকে মেয়ে নিয়ে এসে কী ভুলই-না করেছি। এখন হাড়েহাড়ে বুঝছি। পেটে ছেলে ধরবার ক্ষেমতা নেই, ঝাঁজ দেখ-না।' পরে হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'বাপের বাড়ি বসিয়ে দিয়ে আসব। ফের ছেলের বে দেব। দেখি, কে কী করতে পারে?'

পিসি তখন জিব কেটে বললেন, 'বউদি! তাহলে কিন্তু ভাংচি পড়ে যাবে। ছেলের বে দিতে পারবে না।'

'ব্যস, শাশুড়ীর তর্জন-গর্জন থেমে গেল। পিসি আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে একটু হাসলেন। শাশুড়ীকে বললেন, আর রাগ পুষে লাভ কী বউদি? একটু ঠাণ্ডা জল দাও, দেখি। তোমাদের সঙ্গে বকতে বকতে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ।' তিনি বারান্দায় একটা তক্তপোষের উপর থেবড়ে বসলেন। শাশুড়ী জল আনতে রান্নাঘরে ঢুকলো। এই অবসরে পিসি আমাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে মুচকি হাসলেন।'

'শাশুড়ী একটা প্লেটে গোটা-কতক বাতাসা আর কাঁচের গেলাস-ভর্তি জল এনে তক্তপোষের উপর রেখে বললে, 'নাও দিদি খেয়ে নাও।'

'পিসি হেসে বললেন, 'এখন বাতাসা দিয়ে কাজ সারছো; সারো।

কিছু বলবো না। নাতি এলে কিন্তু এক হাঁড়ি রসগোল্লা চাই। শাশুড়ী জবাব দিলে না। একটু গম্ভীর হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললে।'

পিসি জল খেয়ে বললেন, 'তাহলে কী বলছ বউদি? মিষ্টিমুখ করাবে না?'

'মিষ্টিমুখ! তোমায় সোনার পাশা গড়িয়ে দেব। আগে নাতির মুখ দেখতে দাও।'

পিসি বলতে শুরু করলেন, 'দেখ বউদি! তোমার শ্বশুর-পিত্‌রি-মাত্‌রি—এ তিন কুলে বাতি দেবার কেউ নেই। একটা কানা-খোঁড়াও যদি থাকত, কথা ছিল। তোমার এক ছেলে। ভগবান না-করুন, যদি ভালমন্দ কিছু হয়ে যায়। তখন কী হবে? এত সম্পত্তি সবই তো পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খাবে।'

'শাশুড়ী ঘাড় নাড়ল।'

'পিসি বললেন, 'উপায় একটা আছে। আমার কথা কী শুনবে বউদি?'

'শাশুড়ী উৎসুক চোখে পিসির দিকে তাকালো। 'বৌমা এক-খিলি পান সেজে আনো তো। দেখো, যেন বেশি খয়ের দিও না।' পিসি বললেন।

'আমি পান সেজে আনলাম।

পিসি পান চিবুতে চিবুতে বললেন, 'কথাটা অনেকদিন ধরে বলি-বলি করেও বলা হয়নি। আমাদের কাজের মেয়ে টগরকে তো তুমি চেন?'

'শাশুড়ী ঘাড় নেড়ে বললেন, 'খু-উ-ব চিনি।'

'পিসি বলতে লাগলেন, ওর সোয়ামি হচ্ছে, যাকে বলে একটা চ্যাঁড়শ। অমন সোন্দর সামত্ত মেয়ের দিকে একবারও তাকাত না গা। বারমুখো ছিল বলে কানাঘুসো। রাতে টলতে টলতে এসে টগরকে ঠ্যাঙানি দিতো। সে কোন কথাই আমার কাছে লুকাত না। উঃ সে সব মনে পড়লে আজও গা-টা শিউরে ওঠে। মারের চোটে মুখে-গায়ে-হাতে-পায়ে কালসিটে পড়ে যেত। অথচ দেখ টগর সোয়ামির জন্যে কী না করত! বড় ভাল মেয়ে।'

'এই টগরের অনেকদিন ছেলেপুলে হয়নি। সেজন্য সে প্রায়ই হাহুতাশ করত। শেষে আমিই তাকে পরামর্শটা দিলাম। একটা ছেলে হল। এখন তো দেখতে পাচ্ছ, সে কত বড় হয়ে গেছে। সোয়ামি আর তার গায়ে হাত তুলতে সাহস পায় না। পিসি এবার থামলেন। আমার দিকে

তাকালেন। তাঁর চোখে তখন কৌতুকের নাচন!'

'শাশুড়ী হাঁ করে কথাগুলো গিলছিল। তার অবাক জিজ্ঞাসা, 'কী করে ছেলে হল দিদি?'

'বিশ্বাস করবে বউদি?'

'শাশুড়ী হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

'পিসি তখন ব্যাপারটা ভেঙে বললেন।'

সরলা চুপ করল। আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে লাগল।

এতক্ষণ যেন নাটক শুনছিলাম। জিগ্যেস করলুম, 'ব্যাপারটা কী?'

সরলা জোড়হাত কপালে ঠেকাল।

ভক্তি গদগদ চিত্তে বলল, 'পিসির পরামর্শে টগরদি বাবার থানে হত্যে দিয়েছিল। ব্যস, বাবার দয়া হয়ে গেল। বাবা ওকে একটা পাকা কলা দিয়েছিলেন। ওটা খেতেই ছেলে হল। তবে হ্যাঁ, প্রথম খেপে কিন্তু বাবা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই আবার হত্যে দিতে হয়েছিল।'

মনের কোণে অবিশ্বাসের দানা বাঁধল। জিজ্ঞাসা করি, 'তাড়িয়ে দিয়েছিল! বলিস কীরে? তা তাড়াল কেন?'

সে জবাব দিল, 'তা তো বলতে পারব না। দিদি ও-কথা আমায় বলেনি। তবে কানে কানে একটা কথা বলেছিল।'

উৎসুক হলাম।

সরলা বলল, 'মাসিকের বারো থেকে একুশ দিনের মধ্যে হত্যে দিলে সুফল পাওয়া যায়।' সরলার গলার স্বরে আড়ষ্টতা ফুটে উঠল।

মনে পড়ল, এক সায়েব ডাক্তারের অভিমত। ঐ সময়টা নাকি গর্ভ-ধারণের প্রকৃষ্ট সময়। এইসময় সুপক্ক ডিম্বাণু ডিম্বকোষ থেকে বের হয়ে ডিম্বনালীতে ঢুকে অপেক্ষা করে শুক্রকীটের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে।

'তা তুই কী ওষুধ পেলি?'

সরলা সরলভাবে জবাব দিল, 'বাবা তুষ্ট হয়ে একটা শেকড় দিলেন। আমার হাতেই।'

খুশির ভাব ফুটিয়ে বললাম, 'বাঃ চমৎকার।'

ছেলেটি বেডের উপর এতক্ষণ চুপচাপ শুয়েছিল। এবার সে নড়ে উঠল। সরলা তাকে কোলে টেনে নিল। জিগ্যেস করল, 'তাহলে কোন ভয় নেই, ডাক্তারবাবু? সেরে উঠবে তো?'

হেসে বললুম, 'নিশ্চয়ই। স্বয়ং বাবা যখন তোর সহায়, ভয় কী?

দরকার হলে হত্যো দিবি।'

সরলা খুশি মনে বিদায় নিল।

*

এরপর বাবার অলৌকিক কার্যকলাপের বহু ঘটনার কথা কানে এল। ওখানে ধন্না দিলে তিনি নাকি স্বপ্নে ওষুধ দেন। এতে বন্ধ্যা নারীর সন্তান হয়, মৃতবৎসা নারী সুস্থ সন্তান প্রসব করে, দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম হয়, সম্ভাব্য বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ইত্যাদি। মজা পাচ্ছিলাম।

একেই তো আমার মনটা বড্ড খুঁতখুঁতে। তার উপর গাঁইয়া এক রোগীর কাছে ঠেক খেয়ে খুঁতখুঁতানি ভাব বেশ চাগাড় দিয়ে উঠল। ব্যাপার জানা দরকার। বাবার থানে কোনদিন যাইনি। প্রয়োজন বোধ করিনি। একদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম।

নির্দিষ্ট স্টেশনে নেমে হেঁটে চলেছি। কিছুদূর এসে দোকান-পসার পার হয়ে বাঁদিকে মোড় নিলাম। এক ভদ্রলোক পথ আগলে দাঁড়ালেন। মুখে সেই একই বুলি, 'বাবার পুজো দেবেন? আমাদের নিবাসে চলুন। থাকবার ভাল ব্যবস্থা আছে।'

ভদ্রলোককে দেখে আকৃষ্ট হলাম। গোলগাল চেহারা। মধ্যবয়স্ক। উদ্‌লা গা। কাঁধে সাদা ধপধপে পৈতে। তাতে চাবিকাঠি বাঁধা। মুখে প্রশান্তি। আয়ত দীপ্ত চোখে যেন দূরের আলো। অঙ্গসৌষ্ঠব মার্জিত।

তাঁর আবেদনে সাড়া দিলাম। এবং তাঁর পিছু পিছু একটা বাড়ির সামনে এলাম। রঙচঙে সাইনবোর্ড নজরে পড়ল। তাতে বড় বড় হরপে লেখা, 'যাত্রী নিবাস'। থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত আছে।' বাড়িটা রাস্তা থেকে তিন ধাপ উপরে। একতলা। ধাপ পার হয়ে বারান্দায় উঠলাম। সিমেন্টের মেঝে। বারান্দার দুপাশে ডালার দোকান। সেখানে খুরিতে পুজোর উপকরণ সাজানো। মাঝখানে সরু রাস্তা। বাড়ির ভেতরে ঢোকার একটি মাত্র দরজা। নিচু। তাই মাথা বাঁচিয়ে ঢুকে পড়লাম। ভিতরেও বড় বারান্দা। পুব-পশ্চিমে লম্বা। তিন ধারে সারি সারি ছোট ছোট ঘর। ভাড়া দেওয়া হয়।

ভদ্রলোকের নাম আনন্দ বিশ্বাস। তিনি থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। অল্প বিশ্রাম নিলাম। পোশাক পরিবর্তন করে খালি-পায়ে তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম মন্দির দর্শনে।

মন্দিরের চারপাশ শ্বেত-পাথরে বাঁধানো। খুব মসৃণ, ভিজে ও

পিচ্ছিল। একটু অসাবধান হলেই পা হড়কে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। মন্দির দরজার সামনে ফালি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। মেঝে মোজাইক করা। তবে পিচ্ছিল। দরজা ছোট। একজন লোক যেতে-আসতে পারে। মন্দিরের ভিতরের বিস্তৃতি বড় না। ঘোলাটে অন্ধকার। একধারে বিরাট কুয়ো। আনন্দবাবু বললেন, 'ঐ যে কুয়ো দেখছেন, ওটা চারফুট মতো গভীর। ওর ভেতর বাবা লিঙ্গ দেহে বিরাজ করছেন।' ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। কিছুই ঠাহর হলো না। আমি হাত ঢুকিয়ে দিলাম। মসৃণ শক্ত পাথরের মতো কি-যেন হাতে ঠেকল। কুয়োর পাশে একটা বিরাট রুপোর চাকতি। গর্ত চাপা দেবার কাজে ব্যবহার করা হয়।

ডালায় সাজানো সন্দেশ, (সন্দেশ না ছাই! চিনির ডেলা) পুষ্প, বেলপাতা প্রভৃতি দিয়ে আনন্দবাবু আমার নামে পুজো দিলেন। আরও অনেকে তখন পুজো দেবেন। ভিড় একটু হয়েছে। পুজো শেষে তিনি ডান হাতের মধ্যমা দিয়ে আমার কপালে ফোঁটা দিলেন। নির্মাল্য হাতেই দিলেন।

লক্ষ্য করছিলাম মন্দিরের উপরিভাগ। তিন-চারতলা সমান উঁচু। ছাদ গোলাকার। ঢালু। উপরে গম্বুজ। গম্বুজের মাথায় ঢালাই-করা 'ওঁ' এবং ত্রিশূল।

মন্দিরের পুবদিকে একফালি ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এখান দিয়ে লোকজন চলাচল করে। মন্দির-দেয়ালের পাশে মশলা-বাটা শিলের মতো একখণ্ড পাথর। ওটা নাকি মুকুন্দ ঘোষের স্মৃতি-ফলক। পুবদিকে সারিবদ্ধ বারোটি শিব-মন্দির। উত্তরে পর পর ছয়টি। তারপর সরু ছোট গলি। গলি দিয়ে একটু গেলেই কয়েকটা খাটা-পায়খানা দেখা যাবে। যারা ধর্ণা দেয় তাদের জন্য নির্দিষ্ট। গলির দক্ষিণে আবার পর-পর ছয়টি মন্দির। বেশী উঁচু না। শেষ মন্দিরের দক্ষিণে একটি ছোট স্তম্ভ। ওটা নাকি সামন্তরাজ ভারামল্ল সিংহরায়ের স্মারকচিহ্ন।

নাট-বাঙলাটি মন্দির-লাগোয়া। মধ্যিখানে শ্বেতপাথরের সরু রাস্তা। ঘরটা বিরাট। একশ-হাত বাই ষাট-হাত হবে। দেড়তলা সমান উঁচু। একটি মাত্র সিলিং ফ্যান ও গোটা চারেক বাল্‌ব ঝুলছে। ভিতরে ঢোকবার পথ দু'টো। উত্তরে ও দক্ষিণে কোন দরজা নেই। চারদিকে একই মাপের মোট এগারোটি জানলা। এগুলোও প্রবেশপথের সমান উঁচু ও চওড়া। পাল্লা নেই। তবে নিচের দিকে লোহার গরাদ। চারফুট মতো উঁচু। গরাদের উপরের অংশ চটের পর্দা দিয়ে ঢাকা। দক্ষিণে প্রবেশ-পথের কাছে

একটি থাম। ফুট চারেক উঁচু। পাথরের তৈরী গাই ও ষাঁড় তার উপর। কাছাকাছি তিনটে বড় বড় ঘণ্টা। ছাদ থেকে ঝুলছে। আরতির সময় বাজানো হয়। মেঝে মোজাইক মোড়া।

লাট-বাঙলা ভর্তি মেয়ে-পুরুষ। সবাই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে। বিছানা বলতে কম্বল। বালিশ নেই। ওরা এখানে ধর্ণা বা হত্যে দিয়ে পড়ে আছে।

ধর্ণা দেবার নিয়মকানুন জানতে আগ্রহ প্রকাশ করায় আনন্দবাবু জানালেন, ধর্ণা দিতে হলে যাত্রীকে দু'টো নোতুন কাপড়, একটা গামছা, একটা করে চাদর ও কম্বল আনতে হয়। দুধ-পুকুরে চান করে দেহ পবিত্র করতে হয়। তারপর হবিষ্যি খেতে হয়। পরে নিরম্বু উপোস। তিনদিন। উপোস ভাঙলে যাত্রীকে খেতে দেওয়া হয় বাবার চরণামৃত। মনে হল, দেহ ও মন শুদ্ধ করবার চমৎকার ব্যবস্থা বটে। ভেতো বাঙালি কদ্দিন যুঝবে কে জানে? হত্যে দিতে এসে শেষে আত্মহত্যা না হয়!

জিগ্যেস করি, 'খরচ কি রকম?'

তিনি বললেন, 'খরচ। যৎসামান্য। গদিতে লাগে পাঁচ টাকা চার আনা। তবে আমরা নিই ত্রিশ চল্লিশ টাকা। অবশ্যি গদি-খরচা সমেত।'

'বড্ড বেশি যেন।'

আনন্দবাবুর সহাস্য জবাব, 'আরও টুকিটাকি খরচা আছে। যেমন পূজারীকে রোজ এক টাকা দক্ষিণে দিতে হয়। তিনি যাত্রীর নামে বাবার কাছে পুজো দেন। তাছাড়া পুজো-উপকরণের খরচা আছে। দেখাশোনার জন্যে ঝি আছে। এ-সব মিলিয়ে আর কী।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'আচ্ছা লাট-বাঙলা তো ভর্তি হয়ে গেছে। এবার যদি কেউ হত্যে দিতে আসে··· ?'

আনন্দবাবু বললেন, 'তখন হত্যে দেয় নারায়ণের লাট-বাঙলায়। ওটা আপনাকে পরে দেখাচ্ছি। বাবার কখন পুজো হয়, শুনুন।'

'যাত্রী পুজোর সময় হলো সকাল ছ'টা থেকে ন'টা আর বেলা সাড়ে-এগারোটা থেকে তিনটে। তবে পালা-পার্বণে এ-সময়ের একটু হেরফের হয়। সরকারি পুজোর সময় সকাল ন'টা থেকে সাড়ে এগারোটা। সন্ধ্যে ছ'টায় আরতি। রাত্তির ন'টায় মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আশ-পাশের আলো এমন-কি লাট-বাঙলার আলো সব নিবিয়ে দেওয়া হয়।'

'রাতে পাহারা নেই?'

আনন্দবাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই। দু'জন দারোয়ান আছে।'

লাট-বাঙলার দক্ষিণে আছে একটা মস্ত বড় ঘর। তিনদিকে দেয়াল। উত্তর দিক খোলা। বাবার কাছে যারা মাথার চুল মানত করে, এখানে তাদের ক্ষৌরি করা হয়। তাই এ-ঘরটাকে বলা হয় কামানশালা।

অফিস-ঘরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। অফিস-ঘর ঠিক লাট-বাঙলার পশ্চিমে। মধ্যিখানে পাথর-বাঁধানো সরু রাস্তা। বারান্দায় এক ভদ্রলোক বসে। পঞ্চাশ-ছোঁয়া মাঝারি গড়ন। পেট মোটা। শুনলাম, ইনি হচ্ছেন হিসেবরক্ষক।

মন্দিরের পশ্চিমে দুধপুকুর বা সিদ্ধিপুকুর। চান করবার দু'টো ঘাট। একটি পুরুষ অপরটি মহিলাদের জন্য। ঘাট থেকে মন্দির-চত্বর পর্যন্ত বাঁধানো। খুব বড়ো পুকুর। দীঘি বললেই হয়। কানায় কানায় জল। এর জল নাকি কোন দিন শুকোয় না। পুকুরে মাছ আছে। ঘাটে দাঁড়ালে দক্ষিণ-পশ্চিমে রাজবাড়ি দেখা যায়। দক্ষিণ পাড়ে যাত্রী-নিবাস।

মন্দিরের উত্তরের উঠানটি চার ফুট মতো চওড়া। বড্ড পিছল। হড়কে পড়ে যাচ্ছিলাম। আনন্দবাবু হাত ধরে ফেললেন। কয়েকটা সিঁড়ি টপকে প্রায় পাঁচ-ছ ফুট উঁচুতে মন্দিরের সামনে হাজির হলাম। নারায়ণ-মন্দির। ছোট। আন্দাজ আট ফুট উঁচু। ভিতরের বিস্তৃতি অল্প। নারায়ণ ছাড়া দামোদর, গিরিধারী, দুর্গা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, বাণেশ্বর প্রভৃতি দেবতার ছোট ছোট বিগ্রহ আছে।

নারায়ণ-মন্দিরের লাগোয়া তাঁর নামে লাট-বাঙলা। মূল মন্দিরের পুবদিকে। একতলা সই উঁচু। পঞ্চাশ হাত বাই ত্রিশ হাত। সিমেন্টের মেঝে। লাল রঙ। ছাদ থেকে দুটো বাল্‌ব ঝুলছে। পাখা নেই। মন্দির ও লাট-বাঙলার মধ্যে উত্তর দিকে ছোট গ্রিল গেট। তালা বন্ধ। এখানে পনেরো-কুড়িজন একসঙ্গে ধর্ণা দিতে পারে! সেদিন ছিল ফাঁকা, যাত্রীশূন্য।

যাত্রী-নিবাসে ফিরে এলাম।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম। বিকেলে ভিতর-বারান্দায় একটা তক্তপোষের উপর এসে বসলাম।

আনন্দবাবু এলেন মুড়ি চিবুতে চিবুতে।

আমি বললাম, 'বসুন আনন্দবাবু। এখানে তো নানা ধরণের নারী-পুরুষ আসে বাবার কাছে ধর্ণা দিতে। আচ্ছা বাঁজা-বউ তো আসে, তাই না?'

'আসে বৈকি। কত বউ তো ওষুধ পেয়ে গেল।' আনন্দবাবুর মুড়ি

এগাল ওগাল হল।

বললাম, 'সন্তানের জন্যে মানত করে কে ধর্ণা দিয়েছে—একটু খোঁজ করে বলতে পারেন?'

আনন্দবাবু অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন, 'ঐতো! আপনার পাশের ঘরের বউটি ধর্ণা দেবে। ও তো কাল সকালেই পড়বে।'

'তাই নাকি! বেশ—'

আনন্দবাবু তক্তপোষ থেকে নেমে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আসছি।'

একটু পরে আনন্দবাবুর পিছু-পিছু এক ভদ্রলোক আমার কাছে এলেন। আনন্দবাবু বললেন, 'ইনি এসেছেন আগরতলা থেকে।'

আমি নমস্কার জানিয়ে বললাম, 'বসুন'।

ভদ্রলোক প্রতি-নমস্কার করে আমার পাশে বসলেন।

আনন্দবাবুর হাতে দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললাম, 'চা আর গরম-গরম জিলিপি যদি পান, নিয়ে আসুন।'

ভদ্রলোকের সঙ্গে ক্রমে আলাপ জমে উঠল। নাম মনোরঞ্জন পোদ্দার। সংসারে বুড়োমা, বিধবা পিসি ও দাদা। আগরতলায় কাঠের ব্যবসা। বছর দুই হলো বিয়ে করেছেন। ছেলেপুলে হয়নি। তাই স্ত্রীকে নিয়ে বাবার কাছে এসেছেন হত্যে দিতে। আজই সকালে।

মনোরঞ্জনবাবুকে দেখে কৌতূহল বেড়ে গেল। খাসা গঠন। বলিষ্ঠ চেহারা। ফর্সা রঙ। ঝকঝকে চোখ আর মাথা-ভরতি কোঁকড়ানো কালো চুল। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। সোনার বোতাম। কব্জির ঘড়ি দামী বলেই মনে হল। দেখে তো মনে হয় পয়সাওলা। তবে বিয়েটা একটু বেশী বয়েসেই হয়েছে।

জিগোস করলাম, 'তা আপনি ডাক্তারি চিকিৎসা করেন নি?'

মনোরঞ্জনবাবু বললেন, 'তা আর করিনি। অনেক করেছি। বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছি।'

'তাতেও সারেনি?'

'কই আর সারল।'

মনোরঞ্জনবাবু বললেন, 'আসলে অসুখটা আমারই।' 'ইম্‌পোটেন্সি'।

'এ-রোগ কিন্তু সারে।'

মনোরঞ্জনবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন 'সে কী! ডাক্তাররা যে বললেন কর্ডাইউকুনিয়ার চোট। সারবে না।'

আমি জিগেস করি, 'তাহলে কোমরে কী আঘাত লেগেছিল ?'

মনোরঞ্জনবাবু বিমর্ষ মুখে বললেন, 'হ্যাঁ। বিয়ের কয়েকদিন পরেই মোটর দুর্ঘটনায় পড়ি। তার পরই···। দুমাস নার্সিংহোমে ছিলাম। কিচ্ছু হলো না।'

এমন সময় আনন্দবাবু হাজির হলেন। বাঁহাতে কেটলি আর ডান হাতে রেকাবি। তাতে চারটে মাটির ভাঁড় আর জিলিপি।

কেটলি আর রেকাবি তক্তপোশের উপর রেখে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

পরক্ষণে দেখি, তিনি ফিরে আসছেন। তাঁর পিছে এক বিবাহিতা মহিলা।

মনোবঞ্জনবাবু বললেন, 'আমার স্ত্রী।'

আমি বলি, 'বুঝতে পেরেছি।'

মৃদুলা নমস্কার করল। আমিও প্রতি-নমস্কার করে বললাম, 'বসুন।'

আনন্দবাবু জিলিপি ও চা পরিবেশন করলেন। আমি জিলিপি শেষ করে ধোঁয়া-ওঠা ভাঁড়টা তুলে চুমুক দিলাম। বলি, 'আমিও হত্যে দিতে এসেছি।'

মৃদুলা চোখ তুলে বলে, 'আপনি! কোন দুঃখে ?'

আমি বলি, 'কতজনের কত দুঃখ। সবাকার দুঃখ কী এরকম ?'

'তা ঠিক।'

মৃদুলা মুখ নিচু করে চায়ে চুমুক দিতে লাগল। বয়েস তিরিশের মতো। পরণে আকাশী রঙের শাড়ি। তাতে তারার ফুল। শাড়ির সঙ্গে মিলানো ব্লাউজ। মাথায় ঘন কালো চুল। পরিপাটি আঁচড়ানো। সামনের দিকে ঢেউ। মাঝখানে সিঁথির সরণি। এয়ো-স্ত্রীর চিহ্ন স্পষ্ট। প্রতিমার মতো মুখ। আয়ত চোখ। নাকে চাবি। কানে ঝুমকো। হাতে মান্তাসা। ঘড়ি।

আমার কথা শুনে মনোরঞ্জনবাবু খুশিতে ডগমগ। তিনি বললেন, 'ভালই হলো। বাবার লাট-বাঙলায় জায়গা নেই। নারায়ণের লাট-বাঙলায় মৃদুলাকে একলা থাকতে হতো। হাজার হোক অচেনা জায়গা ত'। আপনি যখন থাকছেন···।'

আমি বললাম, 'বাবার এখানে ভয় কি।'

পরের দিন। সকাল নটা দশটা হবে। মৃদুলা চলে গেল হত্যে দিতে।

যাবার সময় জিগোস করল, 'আপনি কখন যাচ্ছেন?'

আমি বলি, 'এই গেলাম বলে।'

বিকেল বেলা চা-পর্ব সেরে তল্পি-তল্পা নিয়ে সোজা নারায়ণের লাট-বাঙলায়।

গিয়ে দেখি, মৃদুলা কম্বলের উপর বসে। গালে হাত। আমাকে দেখেই সে বলে উঠল, 'ইস্ এত দেরি! ভাবছিলাম, আপনি বোধ হয় আর···।'

'তাই নাকি?'

মৃদুলার কাছ থেকে খানিক তফাতে একটা জুৎসই জায়গা বেছে নিলাম। সেখানে কম্বল পেতে সটান শুয়ে পড়লাম। ডান হাতের কব্জিটাকে মাথার বালিশের কাজে লাগালাম।

মৃদুলার বাস্ত স্বর শোনা গেল, 'কী হলো? সাত-তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন যে?'

'কী করব? এখানে চুপচাপ শুয়ে থাকাই ত কাজ।' আমি বললাম।

মৃদুলা কম্বলের খুঁট পাকিয়ে বালিশের মতো করে নিল। তার উপর মাথা রাখল। আপাদমস্তক চাদর মুড়ি। মনে হল আলাপের ছেদ টানল আজকের মতো।

বৈকালীন নিস্তব্ধতা ভেদ করে ঢং ঢং ধ্বনি কানে এলো। বুঝলাম, বাবার সান্ধ্য আরতি। সমবেত কণ্ঠে পিতৃ-বন্দনা আর ঘন্টা-কাঁসর প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্রের শব্দ শুনে এবং অগণিত ভক্তের উচ্ছ্বাসের কলরোলে বোধ হল, নিথর পাষাণ-পুরীতে বুঝি দেবতা নেমে এসেছেন।

এমন সময় মনোরঞ্জনবাবুর আগমন। স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে আমার কাছে। জিগ্যেস করলেন, 'অসুবিধে হচ্ছে নাকি?'

'না। বেশ আছি।'

তারপর এলেন আনন্দবাবু। আমি বলি, 'খাওয়াটা বেশী হয়ে গেছে। রাত্তিরে কিছু খাব না।'

'বেশ।'

তিনি চলে গেলেন।

রাত বাড়ছিল। হঠাৎ আলো গেল নিবে, আশপাশের আলোও। নিস্তব্ধতা নেমে এলো। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অন্ধকার। শুধু ফালি কুমড়োর মতো চাঁদ আর আকাশ-জোড়া তারা।

ভোরের হাওয়ায় পর্দা দুলে উঠল। কড়কড় শব্দ শুনতে পেলাম। শীত-শীত করছে। জ্বর এলো না কী? ভিতরের অন্ধকার অনেকটা ফিকে হয়ে গেছে। একটা চড়ুই ঢুকল। কিচ্‌কিচ্‌ শব্দে নিস্তব্ধতা ভাঙল। তারপর ফুড়ুৎ করে বাইরে।

উঠে বসলাম। ভোরের আলো তখন ধুয়ে দিচ্ছে মন্দির প্রাঙ্গণ।

পাষাণ পুরী আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। মন্দিরে-মন্দিরে পুজোর আয়োজন। পূজারী, পাণ্ডা ও যাত্রীর ছুটোছুটি। চটের ফাঁকে তখন ঝিকিমিকি নরম-রোদের তেরছা চাহনি।

মৃদুলা আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসল। আলুথালু বেশ। সংযত করে নিল। তার চোখে চোখ পড়ল।

'সুপ্রভাত।'

মুখে সলজ্জ হাসি।

'সুপ্রভাত।'

এমন সময় ঝি এসে পড়ল। মৃদুলা তার সঙ্গে বাইরে চলে গেল।

দুপুরের আহারাদির পর লাট-বাঙলায় এসেই শুয়ে পড়লাম। মৃদুলার দিকে চোখ ফেলতেই দেখি, সে আমার দিকে তাকিয়ে। তার সারা মুখে অবসাদের ছায়া। ক্ষীণ স্বরে শুধাল, 'কী হলো? আপনি যে শুয়ে পড়লেন?'

আমি হেসে বলি, 'শুনেছি বাবা নাকি স্বপ্নে দেখা দেন। তাই ঘুমোবার চেষ্টা করছি।'

রাতে উপোস দিলাম।

রাত্তির ন-টার সময় যথারীতি আলো নিবে গেল। অন্ধকার। ঘরের ভিতর আঁধার তত ঘন না। চটের ফাঁক দিয়ে নীলকান্ত আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম। চাঁদ তার ভাঙা দেহ নিয়ে একখণ্ড মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় ব্যস্ত। আর চারপাশে মিটমিটে তারা তাকে বুঝি ঠাট্টা করছে। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। মৃদুলা ঘুমিয়ে গেছে।

একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। খসখস আওয়াজ শুনে চকিত হলাম। নারায়ণ-মন্দিরের দরজা যেন নড়ে উঠল। চোর-টোর নাকি? তারপর জোর আওয়াজ কিচকিচ। যাক বাবা বাঁচোয়া। একসঙ্গে অনেকগুলো ইঁদুরের হাঁকডাক। তবে নেঙটি কি ধেড়ে অন্ধকারে ঠাহর হল না।

ঘুমটা চটকে গেছে। ভালই হলো। নারায়ণ-মন্দিরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ঐ দিকে আবার বুকচাপা অন্ধকার। সহসা থপথপ।

আওয়াজটা ভারী, উঠে এলো নারায়ণ-মন্দিরের দিক থেকে। আমি উৎকণ্ঠিত মনে তাকিয়ে রইলাম। আওয়াজ মনে হল আরো কাছে। বিস্ময়ে দেখি, বাঙলার প্রবেশ-পথে ঘনীভূত অন্ধকার যেন নড়ে উঠল। গা ছমছম। তবু কৌতূহল চাগড় দিয়ে উঠেছে। ভীতির রেশটা ধীরে ধীরে সরে গেল। একটা বিচ্ছিরি গন্ধ নাকে ঢুকল। বুঝলাম ওটা দেশী।

কারা ওরা ?

চোখ দুটো কৌতূহলে সজাগ। মৃদুলার গায়ে ঢাকা-দেওয়া চাদর আর ঠাহর হলো না। তার আভিজাত্যের মোড়ক ছিন্নভিন্ন, চাদরের সঙ্গে সে-ও। ঘরের ভিতর হাওয়া যেন থমকে দাঁড়িয়ে। বড় বড় নিঃশ্বাসের ওঠা-পড়া শব্দ।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়ে গেল। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া দেহের উপর লুটিয়ে পড়েছে। বিছানার উপর উঠে বসলাম।

মৃদুলার চাহনি তখন আমার উপর। চোখে চোখে ধাক্কা খেলাম। ঝকঝকে অপরূপ স্বচ্ছ চোখে ঝিকিয়ে ওঠা হাসি। এলোচুল ভিজে থসথসে। শান্তকণ্ঠে জিগোস করলাম, 'এত ভোরে চান ?'

ঝটিতি মৃদুলা আমার কাছে এলো। হাতের মুঠো খুলে বলল, 'এই দেখুন, বাবা স্বপ্নে ওষুধ দিয়ে গেছেন।' লাবণ্যময়ীর মুখে বিচিত্র হাসি।

আমি ক্লিষ্ট স্বরে বললাম, 'তাই নাকি ! আশ্চর্য ব্যাপার ! পাথরেরও তাহলে প্রাণ আছে !'

আট

ছেলে চোর

শেষ ফাগুনের মিঠে-কড়া রোদ। মাথার চাঁদি তেতে আগুন। অফিস-টাইম না। তবুও লোকজন যাচ্ছে বাসে বাদুড়-ঝোলা হয়ে। তাই একটি ট্যাকসির জন্যে হা-পিত্যেস হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ডাক্তার শশধর। যাবে নিজের নার্সিং হোমে। সেই ধাপধাড়া গোবিন্দপুর—টালা থেকে টালিগঞ্জ। একটি রোগীর অবস্থা খারাপ। হাই ফিবার। তড়কা হচ্ছে। ফোন এসেছে বেলা দু'টোয়। আর এখন বাজে দশ কম তিনটে। কব্জির ঘড়ি দেখে ডাক্তারবাবু ভুরু কোঁচকালেন। রাগ ও উত্তেজনার ঢেউ মনের মধ্যে আছাড়-খেয়ে পড়ল। পড়বারই তো কথা। নিজের ফিয়েট থাকতে এই হাল। গাড়িটি পড়ে আছে গ্যারেজে মেরামতির জন্য। আজ তিন দিন হলো। কাজ এমন কিছু না। বড়ো জোর একদিনের। মানে, বোকা বানিয়ে পয়সা নেবার ধান্দা। মিস্ত্রী জাতটাই এই রকম। রক্তের দোষ আর-কি ? ডাক্তারের গাড়ি পেলেই গলা কাটার ফন্দি।

হঠাৎ ডাক্তারবাবু দূর থেকে দেখতে পেলেন একটি হলুদ রঙের গাড়ি। হর্ণ বাজিয়ে তীব্র বেগে ছুটে আসছে। আজকাল ট্যাকসি-চালককে মোটেই বিশ্বাস নেই। থামতে চায় না। মগজ তাদের কারসাজির কারখানা। পিছনের সিটে নিজেদের লোককে সওয়ারি সাজিয়ে বসিয়ে রাখা কিংবা লাল রঙের ঘোমটা-পরা মিটার নিয়ে হুস করে বেরিয়ে যাওয়া—আসলে এ-হলো আরোহীর গলা টেপার কায়দা। গাড়ি কাছাকাছি আসতেই তাই ডাক্তারবাবু আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়লেন একেবারে গাড়ির সামনে। চাকা ঘসড়া খেয়ে বিকট শব্দে থেমে গেল। থামতে বাধ্য। দুর্ঘটনা ঘটলে আর রক্ষে নেই। সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক দেশে গণ-ধোলাই নামক অস্ত্রের প্রয়োগ। আইন এখানে ঠুঁটো জগন্নাথ। যা হোক ডাক্তারবাবু ঝটিতি পিছনের দরোজা দড়াম করে খুলে ফেললেন। সটান সিটের উপর বসে সশব্দে দরোজা বন্ধ করে দিলেন। ধারালো গলায় হাঁকলেন, 'টালিগঞ্জ।'

যেতে চাইলেই কী ছাই যাওয়া যায় ? ন্যাড়া রাস্তায় থানাখন্দ, পিচের পিপে আর মিছিলের বাধা। ট্রাম-ট্রাকে ঠোকাঠুকি আর বাস ঠেলার গুঁতোগুঁতি। সবাই চায় আগে যেতে। এ-সময় পুলিশ-দেবতার

ভূমিকা ঠিক পাথরের বিগ্রহের মতো। হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছেন ভক্তদের পুজো নেবার জন্যে। কখনো-সখনো অবশ্যি হরবোলা উপরওলাদের হম্বি-তম্বির কথা কাগজের শিরোনামে স্থান পায়। তবে সবাই জানে ওগুলো ফাঁকা আওয়াজ।

সময় নিয়ে বিলাসিতা করা তো ডাক্তারদের সাজে না। কিন্তু উপায় নেই। বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে কার সাধ্যি এক চুল এগোয়। অগত্যা ডাক্তার শশধর সময় কাটাবার জন্যে একটি সিগারেট ধরালেন। জলন্ত দেশলাই কাঠি রবার মেটরেসের উপর ফেলে দিলেন। পায়ের বুট দিয়ে আগুন চেপে ধরতে গিয়ে ঘাড় একটু নিচু করলেন। আর তখনই নজরে এলো একটি ন্যাকড়ার মোড়ক। সামনের সিটের তলা থেকে উঁকি মারছে।

ডাক্তারবাবু হাত বাড়িয়ে সেটা ঝট ধরে কুড়িয়ে নিলেন। সিগারেট ঠোঁটের কোণে চেপে রেখে মোড়ক খুলতেই তাঁর মাথা গেল ঘুরে। হাতে ফুল-তোলা একটি রুমাল। একটি বৃন্তে দু'টি গোলাপ। একটির পাপড়িতে 'শ'—অন্যটির পাঁপড়িতে 'স'—দু'টি হরফ বেশ নিপুণ হাতে তোলা। শিল্পীসুলভ মনের পরিচায়ক।

কী আশ্চর্য! এটি এখানে কী করে এলো? একমাসও হয়নি। ডাক্তরবাবু এটা সন্তোষকে উপহার দিয়েছিলেন। তবে কী সে এই গাড়ি চেপেছিল? ভুল করে ফেলে গেছে। আচ্ছা আনাড়ি তো! ডাক্তারবাবু মনে মনে একটু বিরক্ত বোধ করলেন।

পরক্ষণেই ডাক্তারবাবুর বুকটা টিপটিপ করে উঠল। তবে কী সন্তোষের কোন বিপদ হল? কলকাতার ট্যাকসি চালক! সবাই তো ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির না।

ডাক্তারবাবু ঝটপট রুমালটা নিজের প্যান্টের পকেটে গুঁজে রাখলেন। ততক্ষণে গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে। বেশ জোরেই। তিনি চালকের উপর তীক্ষ্ন দৃষ্টি ফেললেন। সামনে ছোট আয়নায় তার মুখখানা দেখে নিলেন। বাঙালী। চল্লিশ পেরোনো। তবে কাঠামো দেখলে অনেক বেশী মনে হবে। রঙ ময়লা। রোগা পাতলা গড়ন। মুখ লম্বা। গাল দুটো যেন চুপসে গেছে। গোঁফ-জোড়া খেজুর কাঁটার মতো। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। মাথায় চুলের পাক ধরেছে। বিড়ালের ন্যায় কটা চোখ। ঘোর বাদামী রঙের হাফ শার্ট আর স্কারলেট রঙের ফুল প্যান্ট।

নার্সিংহোমের দোর গোড়ায় গাড়ি থামল। ডাক্তারবাবু নেমে পড়লেন।

মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। ভাড়া দেবার সময় তিনি চালকের আপাদমস্তকে শ্যেন দৃষ্টি বুলিয়ে দিলেন। সে মিটার নামিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে দিল। ডাক্তারবাবু নম্বর প্লেট দেখে নিলেন।

দুশ্চিন্তার চাবুক-খাওয়া মন দিয়ে ডাক্তারবাবু রোগী পরীক্ষা করলেন। জুনিয়ার ডাক্তারকে কিছু উপদেশ দিয়ে তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়লেন নার্সিং হোম থেকে। ছুটতে ছুটতে একটি চলন্ত ট্যাকসিকে থামালেন। পিছনের সিটে বসে ধরা গলায় তিনি নির্দেশ দিলেন, 'গ্রে-স্ট্রীট।' দাড়ি-গোঁফ ভরা একখানা ভরাট মুখে যেন খুশির হাসি ফুটে উঠল। গোলাপী রঙের পাগড়ি নেড়ে চালক বললেন, 'ঠিক হ্যায়, সাব।'

ডাক্তারবাবু আরাম করে বসে সিগারেট ধরালেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বয়েস-ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিলেন।

*

বাল্য, কৈশোর, গ্রাম্য ও ছাত্রজীবনের রঙীন ছবিগুলো একে একে স্মৃতির পর্দায় ফুটে উঠল। শশধর, শঙ্কর ও সন্তোষের বাল্য ও কৈশোরের স্বপ্নময় দিনগুলো দিব্যি কেটেছে বিজয়গড়ে। শঙ্কর ঐ গেরামের জমিদারবাবুর একমাত্র সন্তান। শশধর মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। সন্তোষ বিজয়গড়ে তার মামার বাড়িতে মানুষ। আপনজন বলতে তার বিধবা মা আর মামা। তারা একই শ্রেণীর ছাত্র। পড়ত বিজয়গড় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে। শঙ্করের বাবা ঐ ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারি।

কৈশোরের জগতে থাকে না ধনমানের কোন বেড়া। ভালবাসার স্বচ্ছ আঙিনায় হই-হুল্লোড়ে ভেসে বেড়াত এই তিন কিশোর চঞ্চলতার দামাল হাওয়ায়। এক সঙ্গে ইস্কুলে যেত গাঁয়ের মেঠো রাস্তা দিয়ে। ছুটির পর প্রায়ই তারা হই-হই করে ঢুকে পড়ত ভোলা ময়রার দোকানে। গরম গরম জিলিপির উপর ছিল তাদের ভীষণ টান। খেতে খেতে শঙ্কর বিচিত্র শব্দ করত। সন্তোষ তাকে নিয়ে কত মজা করত। শঙ্কর হাসতে হাসতে জিলিপির দাম মিটিয়ে দিত। বিকেলে বাগদি ও ডোম পাড়ার ছেলেদের নিয়ে বল খেলত গৌরীদাসীর মাঠে। জাত-পাত, মান-গুমোরের কোন বালাই ছিল না। গরমের ছুটির মোহন সুর তাদের মনে ঝংকার তুলত। দশটা না বাজতে তারা জড়ো হতো নিতাই-কাকার বাড়ি। তাঁর কথা মনে পড়লে আজও প্রাণটা হু হু করে ওঠে। বড্ড ভাল লোক ছিলেন ঐ নিতাই-কাকা। আলাভুলো দিল-দরিয়া মানুষ। আদর করে তাদের ডাকতেন,

'ভোমরা' বলে। জবজবে করে তেল মাখিয়ে দিতেন নিজের হাতে। তেল মাখানোর কায়দা ছিল বড় অদ্ভুত। আগে দু'কানে, চোখের কোনায়, নাকে, নাভির কুণ্ডলী ও হাত-পায়ের নখের মুড়িতে তেল ছুঁইয়ে মাথার ব্রহ্মতেলোয় একপলা তেল থাবড়ে দিতেন।

তারপর সর্বাঙ্গ ডলাই-মলাই। উঃ হাড়গোড় ভেঙে যাবার দাখিল। ভাঁটা-পড়া যৌবনেও তাঁর হাতের পেশীগুলো ছিল ইস্পাতের মতো শক্ত। মনে হোত ময়দার লেচিতে তেল মাখিয়ে চাকি-বেলুন দিয়ে বেলা হচ্ছে। মাঝে মাঝে তিনি বগলে সুড়সুড়ি দিতেন। আর তারা হেসে কুটিপাটি। হাসির চোটে উলটি-পালটি দিত। যেন গরম কড়াইয়ে লুচি ভাজা হচ্ছে। তবে বেশ মজা হত। তারা আরাম বোধ করত। নিতাই-কাকা মুখটিপে হাসতে হাসতে বলতেন, 'শোনরে কাঁচা-খাঁটি তেলের গুণ
মাখলে হাড়ে ধরে নাকো ঘুণ।'

নিতাই-কাকার ছিল চার-চারটে ঘানি। দিনরাত ঘুরত। তাই তিনি এ-সব কথা বলতে সাহস পেতেন। আজকাল কেউ কী বলতে সাহস করবেন? তেল মাখলে নির্ঘাত এলার্জি। আর খেলে হৃদযন্ত্র বিকল। হয় মুঠো মুঠো ওষুধ খেতে হবে না-হয় সারাজীবন পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকতে হবে। আহা তেলের কী মহিমা। বলিহারি।

যা হোক, তেল মেখে তিন 'ভোমরা' দুদ্দাড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ত মোড়লপুকুরের টলটলে জলে। হাতের বাড়ি মেরে সাঁতার কাটত। শঙ্কর ছিল জলের পোকা। ডুব-সাঁতারে পাকা। ভুশ করে ডুব দিত আর চোখের পলকে বিশহাত দূরে হুস করে ভেসে উঠত। জলে ঝাঁপাই জুড়ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। শেষে গোমস্তামশাই-এর তাড়া খেয়ে জলকেলি সাঙ্গ করত।

ভরা বর্ষা। ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে। বাড়ি থেকে তারা পালিয়ে যেত মল্লিকদের পড়ো-বাড়িতে। লুডো বা কেরাম খেলায় মেতে উঠত।

শীতকাল। উত্তুরে হাওয়া মারছে। তারা পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়ত শঙ্করের বাগান-বাড়িতে। সেখানে এক মস্ত বড় পুকুর। কাকচক্ষু জল। চারধারে পাড়। জঙ্গলে বোঝাই। দেদার বিছিয়ে আছে খেজুর, আম, জাম আর বেল গাছ। এখানে-সেখানে বুনো-লতার ঝোপ। পুকুরে ভুটো ঘাট। বাঁধানো। ঘাটের কয়েকটা সিঁড়ির ছাল উঠে গেছে। উপরে ছোটখাটো চাতাল। দু-পাশে বসবার জন্য সিমেন্টের যোড়া আসন। সেখানে তারা ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে গল্প-গুজব করত। জলে ভাসাতো শুকনো

পাতার নৌকা। কান পেতে শুনতো ডালপালার ফাঁকে পাখির কিচিরমিচির ডাক আর মর্‌মর্‌ আওয়াজে ঝরাপাতার সঙ্গতের বোল। কচি-কচি পাতার চনমনে হাসি দেখে সন্তোষ বলত, 'ওরে কাঁচা, আধমরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা।'

তারপর একদিন ইস্কুল-জীবনের আনন্দের গোনা দিনগুলো ফুরিয়ে গেল। শঙ্কর ভর্তি হলো কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান-বিভাগে। আর শশধর ও সন্তোষ আশুতোষ কলেজে। শশধর হলো বিজ্ঞানের আর সন্তোষ হলো রাতে কমার্সের ছাত্র। ইতিমধ্যে সন্তোষ পোস্ট-অফিসে একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। অবশ্যি সেটা মামার তদ্‌বিরে।

কৈশোরের আনন্দের আসর হল লণ্ডভণ্ড। গ্রাম্যজীবনের গাঁটছড়া গেল ছিঁড়ে। কাজের চাপে তারা কোণঠাসা। জমিদারী উচ্ছেদ হল। শঙ্করের বাবা মা ধাক্কা সামলাতে না পেরে দেহের মালিকানা ত্যাগ করলেন। শঙ্কর লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে বড়বাজারে লোহা-লক্কড়ের ব্যবসায় নেমে পড়ল। গ্রে স্ট্রীটে একটা গলির ভিতর নিজের বাড়িতে তার আস্তানা গাড়া হল। সঙ্গে ঠাকুর-চাকর। বিয়ে-থা করে সংসার-সুখে তার অরুচি। সন্তোষ বি. এ. পাশ করে পোস্ট-অফিসের চাকরিতেই বহাল রইল। শশধর অতিকষ্টে এম. এস. পাশ করে এখন নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়েছে। নিজের পেশার জগতে ফলাও কারবার করে সে এখন মোটা পয়সার মালিক। টালায় নিজের বসত বাড়ি, গাড়ি, নার্সিং হোম ইত্যাদি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর ভাগ্যের খাতায় জমা পড়েছে।

অনেকদিন পরে। সংসার-সাগরে শুকনো-পাতার মতো ভাসতে ভাসতে সন্তোষ এসে ঠেকল শঙ্করের বাড়ির একতলার একটি ফ্ল্যাটে। অবশ্যি বিনা ভাড়ায়। উভয়ের মনে জোড়া লাগল ছিঁড়ে যাওয়া প্রীতির দড়ি। বউ রমা, বছর তিনেকের ছেলে সুবোধ আর একটি কোলের বাচ্চা নিয়ে এখন সন্তোষের সংসার বেশ জম-জমাট। বাচ্চাটির জন্ম হয়েছে ডাক্তার শশধরেরই নার্সিং হোমে মাস দুই আগে।

গাড়ি গ্রে স্ট্রীটে এসে পড়ল। শশধর চালককে গাড়ি থামাতে বলল। মিটার দেখে ভাড়া মিটিয়ে দিল। সন্তোষের কথা ভাবতে ভাবতে যেই ট্রাম-লাইন পার হতে যাবে, আচমকা একটি ট্রাম এসে সামনে থামল। হুড়মুড় করে বেশ-কিছু মেয়ে-পুরুষ নেমে পড়ল। তাদের দিকে এক পলকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে শশধর গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। গলিটা সরু ঘিঞ্জি আর বড্ড নোংরা।

শঙ্করের বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছে শশধর দেখল, দরোজা খোলা। নিঃশব্দে ঢুকে পড়ল। চারদিক একটা থমথমে ভাব দেখে সে অবাক হয়ে গেল। কেমন যেন ওলট-পালট অবস্থা। যেতে যেতে হিমুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। শঙ্করের বাপের আমলের চাকর। হিমু ফ্যাকাসে চোখে তাকাল। শশধর তার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জিগোস করল, 'তোর বাবু কোথা?' হিমু মাথা হেঁট করে ধীর গলায় বলল, 'যান না। উপরে আছেন।' উপরে যাবার আগে শশধর সন্তোষের ফ্ল্যাটের দিকে পা বাড়ালো। দরোজায় তালা ঝুলছে। শশধরের মনে অবাক জিজ্ঞাসা, ওরা কী বাইরে বেড়াতে গেল? সন্তোষ তো ভবঘুরের মতো ঘোরা একেবারেই পছন্দ করে না। বউদি কিন্তু উল্টো মেজাজের। সন্তোষ দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে এখন বুড়োটে মেরে গেছে। তার হয়ত সখ না থাকতে পারে। তাই বলে কী তন্বী সুন্দরী বুদ্ধিদীপ্ত রমার সখ-টখ বলে কিছু থাকবে না? আর তার সখ মেটাবার ভার পড়েছে শঙ্করের ঘাড়ে। শঙ্কর বিনা দ্বিধায় সে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আজ সে দায়িত্ব থেকে শঙ্করকে কী অব্যাহতি দেওয়া হল? আর অন্ধ বুড়ীমাই-বা গেল কোথা? শশধরের বুকের ভিতরটা গুর-গুর করে উঠল।

এক লহমা দেরি না করে শশধর দোতলায় উঠে গেল। চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে সে ঘরের মধ্যে উঁকি মারল। শঙ্করকে দেখে তার বুকের ভিতরটা খচখচ করে উঠল। পুরনো আমলের থামওয়ালা বাড়ি। বেশ বড় ঘর। দু-জোড়া বড় বড় জানলা। খড়খড়ি লাগানো। খোলা। এক পাশে সোফা-সেট আর একটা টেবিল। মাঝখানে দুটো গদি বিছোনো বেতের গড়ানো চেয়ার। একটার উপর শঙ্কর গা এলিয়ে বসে আছে গালে হাত দিয়ে। বিরস মুখ, উদাস চোখ। অমন ডাঁটো কাঠামোটা যেন ভেঙে পড়েছে। বিকেলের রোদ তার মুখ মুছে দিচ্ছে।

শশধর ডাকল, 'ও শঙ্কর, কী ব্যাপার তোর?'

শঙ্কর বিষাদমাখা মুখ তুলে দেখল। অন্যমনস্কের মতো হাত বাড়িয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, 'তোর কথাই ভাবছি, বোস।'

শশধর চেয়ারের উপর বসে পড়ল। মাথার উপর পাখাটা ক্লান্ত ডানায় ঘুরছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম শঙ্করের কপালে জমে গেছে। শশধর উঠে গিয়ে পাখার গতি বাড়িয়ে দিল। ফিরে এসে চেয়ারের উপর সে আরাম করে বসল। শঙ্কর চুপ হয়ে বসে রইল। তাই শশধর অধীরভাবে জিগোস করল,

'কী ভাবছিস? ক'টা জাহাজ ডুবল?'

শঙ্কর এবার একটু নড়ে-চড়ে বসল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সে খুব বিষণ্ণভাবে বলল, 'জাহাজ না। মানুষ। গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া।'

শশধর গম্ভীর মুখে প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দিল, 'কোন আহম্মুকের এত আস্পর্ধা হল?'

শঙ্কর বুড়ো আঙুল ঠোঁটে ঠেকিয়ে ভারী গলায় বলল, 'সন্তোষ আমাকে জেল খাটাবার ব্যবস্থা করেছে। এইতো ফিরছি থানা থেকে জামিন নিয়ে।'

শশধর অবিশ্বাসের স্বরে বেজে উঠল। 'কী-যে সব আজেবাজে বকছিস!'

শঙ্কর চাপা গলায় বলল, 'বাজে না। কাজের। আমারই দোষ। দেখ, পয়সা থাকলে কলকাতায় খাবার মেলে। মেলে না শুধু মাথা গুঁজবার ঠাঁই। বাড়ির খোঁজে সন্তোষ তো সারা কলকাতা চষে বেড়াল। পেল কী? অযাচিতভাবে এ-বাড়িতে তার থাকার ব্যবস্থা করে দিলুম। তাও বিনা ভাড়ায়। তোর সঙ্গে যুক্তি করে…। মনে পড়ছে?'

শশধর সঙ্কুচিতভাবে বলল, 'হ্যাঁ। তাতে এমন কী দোষ হল? পুরাতন চাল ভাতে বাড়ে। সন্তোষ আমাদের বাল্য-বন্ধু। তার উপকার করবি না তো করবি কার?'

শঙ্কর বিদ্রূপের স্বরে বেজে উঠল, 'দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা। মান নিয়ে টানাটানি। ছেলে চুরির অপবাদ। থানা-পুলিশ হল। এবার কোর্টে জামিন। হিমু ও গদাইকে জড়িয়ে দিয়েছে। অতিকষ্টে হিমুর জামিন হল। গদাইকে ছাড়েনি।'

শুনে, শশধর প্রথমে চমকে উঠল! তারপর ঘৃণার স্বরে বলল, 'ছি ছি। সন্তোষটা এত নিচে নেমে গেছে! আচ্ছা ঝামলা তো!' একটু থেমে সে ভ্রূ কুঁচকে জিগ্যেস করল, 'কোন্ ছেলেটা?'

'দুধের বাচ্ছা।' শঙ্কর ঈষৎ ব্যঙ্গে জবাব দিল।

শশধরের বিস্মিত চোখের জিজ্ঞাসা, 'সন্তোষের ফ্ল্যাটে তো কল্যাপ-স্যাবল্ গেট লাগানো। ভিতরে কুকুর। হলেই-বা দেশী। অন্ততঃ ঘেউ ঘেউ ত করতো। মায়ের কথা না হয় ছেড়ে দিলুম। বয়েস হয়েছে, দেখতে পায় না। বউদি কী করছিল?'

শঙ্কর খেদ করে বলল, 'এজন্যেই তো আমার উপর সন্দেহ।'

'আচ্ছা, ক'টায় সময় এ কাণ্ড ঘটল? কী করে ঘটল? সন্তোষ

তখন কোথা ?' চিন্তিত মুখে শশধরের জিজ্ঞাসা।

শঙ্কর ক্ষীণ গলায় বলল, 'সন্তোষ বেরিয়ে গেছে, শ্যামবাজার পোস্ট-অফিসে। তখন ক'টা হবে ? বড়ো-জোর বেলা ন-টা। আর আমি বেরিয়েছি ঠিক বেলা দশটায়। সঙ্গে হিমু। গদাই একা রান্নাবান্না করছিল। তাকে বলে গেলাম, তাড়াতাড়ি ফিরব। বেলা বারোটায় ফিরে দেখি, বউদি পটাপট মাথার চুল ছিঁড়ছে। সন্তোষেব মা থমথমে-মুখে বসে আছেন। বউদি আমাকে দেখে কান্নায় আছড়ে পড়ল। দেয়ালে, মাথা কুটতে লাগল। পুরো ঘটনা গদাই-এর মুখে শুনলাম। বউদি ছেলেকে তেল মাখিয়ে রোদে দিয়েছিল বারান্দার একপাশে। গেট বন্ধ ছিল। তালা দেওয়া। গেটের পাশে ভোলা বলে কুকুরটা লেজ মুড়ে বসেছিল। বউদি হেঁসেলে ঢুকেছিল মা'র খাবার যোগাড়যন্ত্র করতে। মিনিট কুড়ি সময় লেগেছে। হঠাৎ ভোলার কাঁই-কুঁই শব্দে বউদির ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। দৌড়ে বাইরে এসে দেখে, তালা মেঝের উপর পড়ে রয়েছে। গেট আধ-খোলা। বারান্দায় ছেলে নেই। আর তখুনি চিৎকার, চেঁচামেচি।'

'তো, এত বড় দুঃসংবাদে গদাই কী করল ?' শশধরের গম্ভীরমুখের প্রশ্ন।

'গদাই সঙ্গে সঙ্গে শ্যামবাজার পোস্ট-অফিসে ফোন করে। কিন্তু সন্তোষকে পাওয়া যায়নি।'

'তখন বেলা ক'টা ?'

'আন্দাজ এগারোটা হবে।'

'এ যে দেখছি তাজ্জব ব্যাপার। ছেলে নিখোঁজ হবার খবর তুই কী ক'রে পেলি ?' প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে শশধর শঙ্করের দিকে তাকাল।

শশধরের জেরার মুখে শঙ্কর একটু বিরক্ত বোধ করল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে ধীর-গলায় বলল, 'আমি ও হিমু বেলা বারোটায় ফিরে সর্বনাশের কথা প্রথম জানতে পারলাম। সন্তোষকে আমিও ফোন করলাম। সন্তোষ তখনও নাকি অফিসে পৌঁছায়নি। ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। তাই নিজেই ছুটলাম পোস্ট-অফিসে। সন্তোষকে দেখতে পেলাম না। তার খবর কেউ বলতে পারল না।'

'তা তুই থানায় গেলি না কেন ?'

'তখন যেন ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেলাম। কী করব ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। সন্তোষ তখনও অফিস যায়নি। হয়তো অন্য কোন কাজে

গেছে। যদি সে ফিরে আসে, উত্তম। না হলে বউদিকে নিয়েই থানায় যাব, চিন্তা করে বাড়ি ফিরলাম। ফিরে থমকে গেলাম সন্তোষকে দেখে। সঙ্গে আবার বড়বাবু আর দু'জন সেপাই। ততক্ষণে হিমু ও গদাই-এর হাতে হাতকড়া লাগানো হয়েছে। আমি জোর-গলায় প্রতিবাদ করলাম, 'এ-কি বিনা দোষে...?'

বড়বাবু গম্ভীরমুখে ভ্রূকুটি হেনে বললেন, 'আপনাকেও থানায় যেতে হবে।' সন্তোষকে বেশ উৎফুল্ল বোধ হল। বউদি কেবল ধিক্কারের স্বরে বেজে উঠল, 'ছি ছি! এ-কী করছেন বড়বাবু? এনাকে ছেড়ে দিন।'

ততক্ষণে ছেলে-পাচারের খবর রটে গেছে। চারদিকে ছেলে-বুড়োর ভীড়। আমি অপমানে ও অভিমানে ফেটে পড়লাম। অভিযোগের সুরে বড়বাবুকে বললাম, 'প্রমাণ?'

'বড়বাবুর ঠোঁটের কোণে ধারালো হাসি ফুটে উঠল। তিনি ভ্রূজোড়া কুঁচকে বললেন. 'কোর্টে দেব।'

'নিজের কাছে নিজে বোকা বনে গেলাম। বড়বাবুকে মোটা অঙ্কের দক্ষিণা দিলাম। তাঁর পরামর্শে হার্টের অসুখ বলে ডাক্তারি সার্টিফিকেট দিয়ে আমি ও হিমু জামিন পেলাম। কিন্তু গদাইকে হাজতে পুরে রাখল। অনেক অনুরোধ করলাম। ছাড়ল না।'

শঙ্কর তারপর শশধরের হাতটা ধরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শুকনো মুখে তার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'দেখ, নাড়ি টিপে রোগ ধরা যায়, কিন্তু মন বোঝা যায় না। এখন সবকিছু তোর উপর নির্ভর করছে! সন্তোষকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কেসটা তুলতে পারিস কিনা দেখ। এ-হলো বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।'

শশধর বলল, 'ঠিক আছে। দেখি কী করা যায়? আচ্ছা ওরা গেল কোথা? দরোজায় ত তালা ঝুলছে।'

শঙ্কর চিন্তিতমুখে বলল, 'তা তো বলতে পারবো না। থানা থেকে ফিরে আমিও তাই দেখছি। আর ভোলা আড় মেরে দোরগোড়ায় শুয়ে। পাড়ার দুর্গাবাবুর মুখে শুনলাম, ওরা নাকি মালপত্তর টেম্পোর উপর চাপিয়ে চলে গেছে।'

শশধর চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল। পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করল। শঙ্করকে অফার করে নিজে ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'অত ঘাবড়ে গেলে চলবে না। এর মধ্যে নিশ্চয়ই রহস্য আছে। খুঁজে বের

করতে হবে। তাহলেই আসল অপরাধী ধরা পড়বে।'

শশধর একটু থেমে কী যেন চিন্তা করল। লম্বা টান দিয়ে উপর দিকে এক-রাশ ধোঁয়া ছাড়ল। বাঁ হাতে চোখ দুটো রগড়ে নিল। জিগোস করল, 'আচ্ছা তোদের সম্পর্কে কী কোন চিড় ধরেছিল?'

শঙ্কর ঘাড় নেড়ে জবাব দিল, 'না তো। ছুটির দিনে আমার ঘরে সন্তোষ ও বউদিকে নিয়ে তাসের আড্ডা বেশ জমে উঠত। সন্তোষের ফিরতে দেরি হলে বউদি বড় ছটফট করত। তাই ওদের ঘরে গিয়ে বসতাম। বউ-দির সঙ্গে খোশ-গল্প করতাম অনেক রাত পর্যন্ত। তার পাকা-হাতের তৈরী খাস্তা কচুরি ও চা খেতাম। সন্তোষ ফিরে এলে আর এক প্রস্থ চায়ের পর্ব চলত। কোনদিন সন্তোষ বলত, তোর জন্যে গঙ্গার ইলিশ এনেছি। ভাজা খেয়ে তবে যাবি। প্রায়ই সে ম্যাটিনি শো-এর দুটো টিকিট এনে বলতো, কাল তোর বউদিকে নিয়ে যাবি। আমার ত একদম ফুরসৎ মিলছে না।'

শশধর মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনল। গলগল করে এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে সে বলল, 'দেখ শঙ্কর, আজকে যা ঘটল, তা কোন আকস্মিক ব্যাপার না। এর প্রস্তুতি অনেকদিন ধরেই চলছিল বলে মনে হয়। দেখ, আমার কিন্তু খটকা লাগছে। গেটের চাবি খোলা—ওটা চোরেদের পক্ষে এমন-কিছু কঠিন কাজ না। কিন্তু বাড়িতে কুকুর। অথচ অচেনা লোক দেখে সে টু শব্দ করতে ভুলে গেল। এটা কী করে সম্ভব? চোর নিশ্চয়ই চেনা-জানা লোক। শঙ্করের অফিস যাবার কথা বেলা দশটায়। অথচ বারোটা পর্যন্ত তার কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। এটাই-বা কেমন করে হয়? তর্কের খাতিরে না-হয় ধরে নিলুম যে অন্য কোন জরুরি কাজে আটকে পড়েছিল। পোস্ট-অফিস থেকে ফিরে তুই তো দেখলি সন্তোষ বাড়িতে পুলিশ নিয়ে হাজির। তা হলে ছেলে-চুরির ঘটনা সে জানল কখন্? আর জানলই যদি, সে আগেভাগে থানায় গেল কেন? তোর সঙ্গে ত যুক্তি-পরামর্শ করতে পারতো। তাই না?'

কেমন যেন ধাঁধায় পড়ে গেল শঙ্কর। সে উদাসভাবে শশধরের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর তার চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠল। সে ভ্রূ কুঁচকে একটু চিন্তা করে বলতে শুরু করল, 'দেখ শশধর, একটা কথা ভুলে গেছিলাম। এখন মনে পড়ছে।'

শশধর জিগোস করল, 'কী?'

শঙ্কর বলল, 'মাস চারেক আগে বউদিকে একটা সোনার হার গড়িয়ে

দিয়েছিলুম। বউদির বাপের দেওয়া হারটা সন্তোষ বুঝি বিক্রি করে বাজারের দেনা শুধেছিল। সেই নিয়ে ওদের মধ্যে প্রায়ই বচসা হতো। বন্ধুর রোজগার তো যথেষ্ট না। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরে। মাইনে আর কত? তাই আব-কি। হার দেখে সন্তোষ কী করল জানিস?'

শশধরের কৌতূহলী প্রশ্ন, 'কী?'

শঙ্কর খেদের সঙ্গে বলল, 'সন্তোষ পরের দিন সকালে ছুট্ করে আমার ঘরে ঢুকল। আমি তখন সবেমাত্র চায়ে চুমুক দিয়েছি। সে আমাকে চমকে দিয়ে হারটা বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। বেশ রুক্ষগলায় বলল, 'আমি গরিব হতে পারি, ভিখিরি নই।' তারপর হনহন করে বেরিয়ে গেল। এর মধ্যে দোষের কী আছে? মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। এরপর ওদের সঙ্গে কিছুদিন কথা বন্ধ। কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া ব্যবহার লক্ষ্য করলাম।'

শশধর তামাশা করে বলল, 'মানে ঘা পড়ছে।'

শঙ্কর হাত মটকে আবার বলতে শুরু করল, 'তারপর কী হল জানিস? দশদিনও হয়নি। সন্তোষের মা আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমার তো মা নেই। ওর মাকেই নিজের মায়ের মতো শ্রদ্ধা-ভক্তি করি। তাই গেলাম। তিনি আমার বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'তুমি কিছু মনে করোনা বাবা। আমরা তোমার কাছে অপরাধী। সন্তোষ বড্ড রগচটা। ওকে তুমি মাপ কর।' সন্তোষ সে-সময় পাশের ঘরে ছিল। সে এসে হঠাৎ আমার হাত ধরে বলে, 'ভুল হয়ে গেছেরে। বড্ড ভুল।' কথাগুলো হাহাকারের মত শোনাল।'

শশধর পা নাচাতে নাচাতে বলল, 'দেখ শঙ্কর, বন্ধুপত্নীকে উপহার দেওয়ার মধ্যে কোন দোষ খুঁজে পাচ্ছি না। বিয়ের সময় ত আমরা কত দামী দামী উপহার দিয়েছি। সন্তোষ তখন তো উল্লাসে টৈটুম্বুর। আর এখন সোনার হার নিয়ে কি না হুলস্থূল। বিশ্বাস হয় না। এর আগে থেকে নিশ্চয়ই তোদের সম্পর্কে ঘুন ধরেছিল।'

শুনে, শঙ্কর যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। পরে ইতস্তত করে সে বলল, 'তোর কথা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারছি না। তখন অধিশ্যি ব্যাপারটা অত তলিয়ে দেখিনি। এখন মনে হচ্ছে, সন্তোষ বোধ হয় আমার সন্দেহের চোখে দেখত।'

শশধর সোৎসুক জিগ্যেস করে, 'কিসের সন্দেহ? খুলে বল। এর মধ্যেই হয়ত আছে রহস্যের চাবিকাঠি।'

শঙ্কর নিচু গলায় বলতে শুরু করল, 'অফিসের ছুটির পর সন্তোষ বাড়ি ফিরত না। টিউশানি করত। ফিরত রাত্তির করে। বউদি দিনরাত ঘরে বন্দী থেকে যেন হাঁপিয়ে উঠত। একঘেঁয়েমি তার ভাল লাগত না। এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া হতো। তাই সন্তোষের নির্দেশে বউদিকে নিয়ে বহু জায়গায়—সিনেমায়, ময়দানে, চিড়িয়াখানায়, গঙ্গার ধারে, রেস্তোরাঁয় যেতাম। এ-সব তোকে ত আগে কতবার বলেছি। আমরা বাইরে গেলে হিমু, বুড়ি-মা ও ছেলে সুবোধকে দেখাশোনা করত।'

শশধর এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। সে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জানালার দিকে একবার মুখ ফিরে তাকাল। তখন বিকেল পড়ে গেছে। রোদ মরে এসেছে। সে শঙ্করকে বলল, 'চায়ের নেশা চেপেছে। হিমুকে চা আনতে বল। আমি ততক্ষণ শ্যামবাজার পোস্ট-অফিসে ফোন করে দেখি।'

শশধর উঠে গেল। ঘরের একপাশে টেবিলেব উপর রাখা ফোনটা তুলে ডায়েল ঘুরাল। মাস্টার মশাই-এর সঙ্গে কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল। গম্ভীর গলায় সে বলে উঠল, 'অনুমান মিথ্যে নয় রে, শঙ্কর। বিনা নোটিশে অফিস কামাই।'

শশধর এসে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। কৌতূহলী দৃষ্টিতে শঙ্করের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, 'হ্যাঁ, কী যেন বলছিলি?'

শঙ্কর কী যেন বলতে গিয়ে ইতস্তত করল। একটু চুপ করে রইল। হিমু চা নিয়ে এলো। শঙ্কর এক-চুমুক চা খেয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল কী-যেন ভাবতে লাগল। শশধর চা শেষ করে বলল, 'নে খেয়ে নে। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

শঙ্কর চা শেষ করল। কাপডিস টেবিলের উপর ঠক করে রাখল। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল। লাজুক মুখে ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে শুরু করল।

'ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াবে, তখন কী ছাই বুঝতে পেরেছি? আমাদের মধ্যে মন-কষাকষি, মান-অভিমান বলে কিছু নেই। বুকের মধ্যে দাপাদাপি করত অফুরন্ত আনন্দ। রাত্তির হয়ে গেছে। এগারোটা হবে। সন্তোষ তখনও ফেরেনি। বিশ্ব চরাচর ডুবে গেছে জ্যোৎস্নার দুধ-সাগরে। পাশের ঘরে মা'র নাক ডাকছে। মাঝে মাঝে গলার ঘড়্ ঘড়্ আওয়াজ

কানে আসছে। আমি সন্তোষের বিছানার উপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছি। খাটের একপাশে সুবোধ ঘুমে কাদা। এমন সময় বউদি আমাকে এক প্লেট গরম খিচুড়ি ও ডিম ভাজা দিল। খিচুড়ির গন্ধে খিদে চনচন করে উঠল। একটু একটু করে খাচ্ছি।

'বউদি শুধোয়, কেমন হয়েছে'?

'আমি তার দিকে মুখ তুলে তাকাই। দেখি তার চোখ জোড়া ভীষণ উজ্জ্বল। মুখে লাবণ্যের ঢল। সুন্দর ভঙ্গিতে মুচকি হেসে বলি, 'আঃ তোফা রান্না। অমৃত।'

'বউদির মন খুশিতে ভরে গেল। সে বলল, আর একটু নাও।'

'না না। পেটে একটু জায়গা রাখতে হবে বৈকি। না হলে গদাই দুঃখু পাবে।'

'বউদি মগে করে বালতি থেকে জল তুলে হাতে ঢেলে দিল। হাত-মুখ ধুয়ে ফেললাম। তোয়ালে দিল। হাত-মুখ মুছে ফেললাম। টেবিলের উপর ফুলদানি থেকে একটা গোলাপ তুলে নিলাম। তখনও বেশ তাজা। বউদি আচমকা সেটা আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল। নিজের খোঁপায় গুঁজে মুখ টিপে হাসল। আমার দৃষ্টিতে তখন আচমকা টান পড়ল। হালকা কমলা-রঙের ফিনফিনে শাড়ি ও রঙমেলানো ব্লাউজের আড়ালে আগুনের সোনালী আভায় আমার চোখ দুটো যেন ঝলসে গেল। যৌবন-সাগরে রূপের ঢেউগুলো যেন আছাড় খেয়ে পড়ছে। টিকলো নাকের ডগায় ঝিকমিকে নাকছাবি যেন রহস্যময় বোধ হল। কানের দুলজোড়া চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি বিছানার উপর বালিশে হেলান দিয়ে একটা কিং-সাইজ সিগারেট ধরালাম। বউদি ছাইদানিটা আমার পাশে রাখল। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে সে আমার মুখোমুখি বসল। থৈ থৈ খুশিতে সে যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল। আমি তাকিয়ে রইলাম তার নিষ্পাপ মুখের দিকে এক-দৃষ্টিতে। হুঁশ নেই। সম্বিত ফিরে পেলাম যখন সিগারেটের আগুনে আঙুলে ছ্যাঁকা লাগল। আর তখনই নজর গেল দরোজার দিকে। বাহারী পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম সন্তোষকে। পর্দার আড়ালে কখন্ থেকে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে? চোখে তার আগুনের ঝলক। আমি বউদিকে ইসারা করলাম। কিন্তু সে বুঝতে পারল না। তার মধ্যে আচ্ছন্নভাব লক্ষ্য করলাম।'

'সন্তোষ ঝাপটা মেরে পর্দা সরিয়ে দিল। ক্ষিপ্রগতিতে ঘরের মধ্যে

ঢুকে পড়ল। ঘরের হাওয়া বদলে দেবার চেষ্টা করলাম। মুখে খুশির ভাব ফুটিয়ে বললাম, 'এই তো সন্তোষ এসে পড়েছে। এতক্ষণ আমরা ভেবে মরছিলাম। যাক্ বাবা বাঁচা গেল।'

সন্তোষের গম্ভীর মুখ অন্ধকারে ঢাকা। সন্তোষ কোন উচ্চ-বাচ্য করল না। আমি উৎকণ্ঠিত স্বরে জিগোস করলাম, 'এত দেরি?'

সন্তোষ তাচ্ছিল্যভাবে জবাব দিল, 'এই হয়ে গেল।'

বউদি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। আপেল-রাঙা মুখে ক্ষোভের ভাব ফুটিয়ে বলল, 'রোজ রোজ দেরি করবে। ঠাকুরপো কী চৌকিদার? ওনার কী কাজকম্ম নেই?'

সন্তোষ ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'না ফিরলেই তো ভালো হতো।'

শুনে, আমি মুখে হাসি ফোটালাম। কিন্তু সেটা থমকে গিয়ে ঠোঁটের কোণে আটকে গেল। আসলে সন্তোষের কোন দোষ নেই। এটা যুগের হাওয়া। দুম করে একটা কথা বলে দিলেই হল। কিসের কী মানে, মানুষ তা ভেবে-চিন্তে দেখে না। পরিস্থিতি হালকা করবার জন্যে আমি বড় করে একটা কপট হাই তুলে বললাম, 'ঘুম পাচ্ছে। চলি। তোরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নে।'

শশধর কিছুক্ষণের জন্যে চিন্তা-সাগরে তলিয়ে যায়। তারপর গম্ভীর-স্বরে জিগোস করল, 'আচ্ছা এটা কদ্দিন আগের ঘটনা?'

শঙ্কর একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'প্রায় বছর-খানেক হবে।'

'তোর উপর সন্তোষ কী রাগটাগ করেছিল?'

শঙ্কর নিস্পৃহভাবে জবাব দিল, 'মনে হয়, না। কারণ এ-ঘটনার দিন-দুই বাদে সকালে ঘরে বসে কাগজ পড়ছি। হঠাৎ ধূমকেতুর মতো কোথা থেকে সন্তোষের আবির্ভাব। কিছু জিগোস করবার আগেই সে হলদে রঙের দুটো পাকানো কাগজ আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'তোর বউদিকে নিয়ে যাস। আমার মোটেই সময় নেই।' আর কোন কথা না বলে সে হনহন করে বেরিয়ে গেল। কাগজের মোড়ক খুলে দেখি, নুন-শোয়ের টিকিট।'

'মনের খটকা দূর হয়ে গেল। সন্তোষের আসতে দেরি হলে আগের মতো আমি বৌদিকে চৌকি দিতাম।' শঙ্কর খানিক জিরেন নিয়ে আবার বলল, 'প্রায় আট-ন' মাস আগের একটা ঘটনার কথা বলি, শোন।'

শঙ্কর শুরু করল, 'একদিন অফিস বেরোবার মুখে সন্তোষ আমার ঘরে

এলো। হাতে বত্রিশ টাকা গুঁজে দিয়ে বলল, 'আজ তোর বউদিকে স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখিয়ে আনবি।' ব্যস, সে শশব্যস্তে বেরিয়ে গেল।

'বউদিকে নিয়ে ডাক্তার পোদ্দারের চেম্বারে গেলাম। তিনি পরীক্ষা করলেন। আমার হাতে ব্যবস্থাপত্র দিয়ে তিনি বললেন, 'প্রায় দু'মাসের মতো অন্তঃসত্ত্বা। রক্ত, পেচ্ছাব প্রভৃতি পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে মাসখানেক বাদে আবার যেতে বললেন।

'খুশিতে মন ভরে গেল। বউদিকে ঠাট্টা করে বললাম, 'এবার নির্ঘাত মেয়ে।'

'স্বপ্নাতুর চোখ মেলে বউদি বলল, 'তাহলে মেয়ে-বিদেয়ের ভারটা আপনি নেবেন।'

'সন্ধ্যের পর সন্তোষের ঘরে ঢুকলাম। সোল্লাসে চিৎকার করে বললাম, 'খবর শুনেছিস নিশ্চয়ই।'

'সন্তোষ তখন চেয়ারের উপর বসেছিল। কথার কোন জবাব না-দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল।

আমি একটু হকচকিয়ে গেলাম। আনন্দের মধ্যে কেন বিষাদের ছায়া? সন্তোষের ভাবান্তর দেখে জিগোস করলাম, 'কী হল? এত ভাববার কী আছে? শশধরের নার্সিং হোম তো রয়েছে।'

'সন্তোষ ঘাড় না তুলে অস্ফুট-স্বরে বলল, 'সবই ভবিতব্য।'

'ইতিমধ্যে বউদি চা-বিস্কুট নিয়ে এলো। চা খেতে খেতে সন্তোষকে জিগোস করলাম, 'তুই খাবি না?'

'সন্তোষ ধরা গলায় জবাব, 'না, শরীর ভাল নেই।'

'আমি ঈষৎ হেসে বলি, 'শরীর না মন?'

'সন্তোষ কথার কোন জবাব দিল না। আমি খুব অস্বস্তি বোধ করলাম। চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে কাপ-ডিস টেবিলের উপর রেখে দিলাম। সন্তোষের দিকে তাকালাম। মনে হল তার মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো যন্ত্রণায় পাক খাচ্ছে। বললাম, 'অনেক কাজ আছে। চলি।'

'সন্তোষ এড়িয়ে যাবার ভঙ্গিতে বলল, 'আচ্ছা।'

শঙ্কর একটু জিরেন নিয়ে বলল, 'দে, একটা সিগারেট দে।'

শশধর ঝটিতি কেস থেকে একটা দামী সিগারেট বের করে বন্ধুর দিকে বাড়িয়ে দিল।

শঙ্কর সিগারেটে টান দিয়ে বলে উঠল, 'আঃ কী আরাম।'

শশধর ঈষৎ ব্যঙ্গে বলল, 'ইস্ আরাম! খরচা করে ব্যারাম ডাকা। যখন হৃদরোগ হবে বুঝতে পারবি।'

'ধন্‌র!' শঙ্কর ধিক্কারের স্বরে বেজে উঠল, 'ঐ সায়েব-ডাক্তারগুলো তোদের মাথা খেয়েছে। একটা বুলি শিখে রেখেছিস ধূমপান আর স্নেহ-পদার্থ—তেল, ঘি, মাখন, হার্টকে বিগড়ে দেয়। বলি এর বাইরে কত-কী আছে, তার খবর রাখিস?'

শশধরের কৌতূহলী প্রশ্ন, 'শুনি, আর কী?'

শঙ্কর বলল, 'তবে শোন, হার্টের পয়লা নম্বর দুশমন হলো দুশ্চিন্তা, ইংরেজিতে যাকে বলিস টেনশন। দু-নম্বর হলো খাবার—যেমন দূষিত জল, খুব গরম খাবার, তিত রসযুক্ত ভোজন, বিরুদ্ধ আহার (যেমন মাছ মাংস দুধ এক সঙ্গে খাওয়া) বেশী মশলা, ভাজাভুজি, অতিভোজন, ভুক্ত দ্রব্য হজম হবার আগেই আবার ভোজন। তিন নম্বর হলো নেশা। ধূমপান তো বটেই। তামাকু দোক্তা জর্দা এগুলোও ধূমপানের সমান ক্ষতিকারক। চার নম্বর হলো, প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া। যেমন তৃষ্ণা, ক্ষুধা, মলমূত্র, শুক্র, কাসি, ঢেকুর, অশ্রু ইত্যাদির বেগ ধারণ করা। পাঁচ নম্বর শত্রু হলো, অতিরিক্ত পরিশ্রম, এক পেট খেয়ে বিশ্রাম না নেওয়া, ওপর-নিচ করা, এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় ঝাঁকুনি খেতে খেতে গাড়িতে যাতায়াত করা, বেশী রাত জাগা আর দিনে নাক ডাকিয়ে ঘুমান।'

শশধর এতক্ষণ হাঁ করে শঙ্করের কথাগুলো গিলছিল আর ভাবছিল, বাঃ চমৎকার! শঙ্কর তো যুক্তিসঙ্গত কথাই বলছে। শঙ্কর থামতেই সে প্রতি-প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, 'তুই তো দুশ্চিন্তার কথা বলছিস। আচ্ছা এই কাঁটাটা কী করে তোলা যায় বলতে পারিস?'

শঙ্কর বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বলল, 'ও আর এমন কী শক্ত। দুশ্চিন্তাকে হটাতে হবে সুচিন্তার দ্বারা। এছাড়া অন্য কোন পথ নেই। ঈশ্বর-চিন্তাই হলো সুচিন্তা। বাকি সব দুশ্চিন্তা। আধ্যাত্মিক জগতে ঢুকতে পারলে মন আনন্দে ভরে উঠবে। মনে যদি সব সময় আনন্দ থাকে, হার্টের অসুখ ত্রিসীমানায় ঘেঁসবে না।'

শশধর এতক্ষণ কথাগুলো চুপ করে শুনছিল। শঙ্কর থামতেই সে বলে উঠল, 'উহুঁ। এবার আমার মগজে ঢুকল।'

শঙ্করের অবাক প্রশ্ন, 'কী ঢুকল?'

শশধর মৃদু হেসে জবাব দিল, 'কেন তোর চিরকুমার হবার শখ।'

শঙ্কর চুলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, 'হ্যাঁ, তোর আন্দাজ শতকরা একশ' ভাগই ঠিক। সংসার পাতলেই ঝাঁকামুটের মতো দুশ্চিন্তার পাহাড় মাথায় করে বইতে হবে। তার চেয়ে এ বরং বেশ আছি।'

'বেশ আছিস? তবে ঐ যে বললি শুক্রের বেগ ধারণ করলে হার্ট বিগড়ে যায়? ফুলে ফুলে মধু···। কী বলিস?' বলেই শশধর হেসে উঠল হোঃ হোঃ করে।

শঙ্কর লম্বা টান দিয়ে ছাইদানির ভিতর সিগারেট গুঁজে রেখে বলে উঠল, 'জানিস, একদিন কী হলো?'

'জানি না। বল্—'

শঙ্কর বলতে শুরু করল, 'এ-ঘটনার দিন-কতক পরে সন্তোষের ঘরে ঢুকলাম। রেডিয়োতে স্থানীয়-সংবাদ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। সন্তোষ তখনও ফেরেনি। রাত করে ফেরা ওর অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। দেখি, বউদি বিছানার উপর নিঝুম হয়ে বসে। চোখেমুখে থমথমে ভাব। আমি জিগ্যেস করি, 'কী হলো? চুপচাপ বসে?'

'এমনি।' ক্ষীণ স্বরে জবাব দিয়ে বউদি উঠে দাঁড়াল। আমাকে দেখলে যে, আহ্লাদে আটখানা হতো, মনে হলো বিষণ্ণতা তাকে গ্রাস করেছে। সাজগোজ আটপৌরে। তেলহীন রুখু কেশ। থুঁতনিতে কালশিটে দেখে আমি আঁৎকে উঠলাম। তখন আমার অবাক প্রশ্ন, 'একী! চোট লাগল কী করে?'

'ও কিছু না।' বলেই ব্যস্ততার সঙ্গে বউদি হেঁসেলে ঢুকে পড়ল। মনটা হু হু করে উঠল। বিছানার উপর ধপাস করে বসে পড়লাম। একটু পরে হাওয়ায় ভেসে এলো কেটলির সোঁ সোঁ আওয়াজ। পরক্ষণে কাপডিসের ঠুংঠাং বোল।

একলা বসে আছি। মনে আবোল-তাবোল চিন্তা। আনমনা হয়ে গেছি।

চমক ভাঙল বউদির ভাঙা-গলার কথায়: 'নিন খেয়ে নিন।' তার হাতে ধূমায়িত চা ও খান-চারেক বিস্কুট।

আমি কপট অভিমানে বললাম, 'না। কিছু খাব না। আগে বলতে হবে···।'

'সব কথা কী সব্বাইকে বলা চলে?' বউদির মুখে গাম্ভীর্য ফুটে উঠল।

বুঝলাম, কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে। বউদি সেটা চাপা দিতে চাইছে। তাই কথা না বাড়িয়ে কাপ-ডিস হাতে নিলাম।

'ঐ যা তরকারিটা ধরে গেল।' বলে বউদি আবার হেঁসেলে ঢুকে পড়ল। বুঝলাম, ছুতো। বউদি আমাকে এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু কেন? অসোয়াস্তি বোধ করলাম। তাড়াহুড়ো করে চা শেষ করলাম। এক দণ্ড আর বসতে ইচ্ছে করল না। হেঁকে বললাম, 'আসছি, বউদি।'

'আচ্ছা আসুন।' খুন্তি-নাড়ার খট খটাং শব্দে বউদির গলার আওয়াজ যেন পাক খেতে লাগল।

সেই থেকে সন্তোষের ঘরে বড-একটা পা দিতাম না। সন্তোষের মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ্য করি। কেমন-যেন আনমনা, ছন্নছাড়া ভাব। চাল-চলনে অস্থিরতা। সন্তোষ কী পাগল হয়ে গেল? নাকি ভাঁড়ামি? কে জানে।

একদিন দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শীতের নরম-রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছি। আর ভাবছি, সন্তোষ ও বউদির মানসিক পরিবর্তনের কথা। এর কারণ কী? নবাগতের শুভ আগমনই-কী এর হেতু? এমন সময় বউদির অকস্মাৎ আবির্ভাব দেখে আমি বিস্মিত। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। তার চোখে-মুখে উত্তেজনা ও গভীর দুঃখের ছাপ।

আমি কিছু বলার আগেই বউদি বলে উঠল, 'আপনার ডাক্তারের কাছে আজ আমায় নিয়ে যেতে পারবেন?'

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে জিগ্যেস করি, 'কেন? কী হলো?'

বউদি নতমুখে ক্ষীণস্বরে বলল, 'আপনার বন্ধু যাকে চায় না, তাকে কী করে পেটে ধরে রাখি বলুন?'

আমি রাগের সঙ্গেই বলে ফেললাম, 'এসব কী বলছেন? এ কাজে সাহায্য করা আমার পক্ষে সম্ভব না।'

বউদি তখন ঝেঁঝে উঠল, 'তাহলে আপনাদের জগৎ থেকে আমাকেই বিদেয় নিতে হয়। কথাটা ভেবে দেখবেন।' যেমন আকস্মিক আগমন তেমনি তড়িৎ প্রস্থান।

একদিন যার স্বপ্নাতুর চোখে দেখেছি বিজলীর খেলা, আজ সেই চোখে আগুনের হলকা। আমি ঘাবড়ে গেলাম। কথার কোন পারম্পর্য পেলাম না। মেয়েদের অন্তরে সিঁধ-কাটা কঠিন কাজ। পাঁয়তারা দেখে ভয় হলো। কী জানি রাগের মাথায় কিছু যদি করে বসে আমার বাড়িতে?

শেষে আমারই বদনাম।

এক লহমা দেরি না করে ছুটলাম বউদির বাপের বাড়ি, সোনারপুর। তার বাবাকে ব্যাপারটা খুলে বললাম। তারপরে তিনি এসে বউদিকে নিয়ে গেলেন।'

শশধরের ঠোঁটে পাতলা হাসি ফুটে উঠল। 'ব্যাপারটা ক্রমশঃ স্বচ্ছ হচ্ছে। তারপর?'

শঙ্কর কাঁধ ঝাঁকালো। 'তারপর আর কী। সে-সব তো তোর জানা। তোর নার্সিং হোম থেকে এখানে। তারপর জেলে যাবার পরোয়ানা।'

শশধর বলল, 'ঠিক আছে। ব্যাপাবটা মোটামুটি বুঝেছি। কিছু ভাবিস নি। মা ভৈঃ।' শশধর বিদায় নিল। তখন কলকাতার রাজপথ ভেসে যাচ্ছে আলোর স্রোতে।

শশধর চিন্তার ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খেতে খেতে বাড়ি পেঁছাল। দোরগোড়ায় পা দিতেই তার মেজাজ গেল বিগড়ে। স্ত্রী সুগীতার উপর বেগে টং। সুগীতা তখন রেডিয়োতে শুনছে চটুল হিন্দিগান। হিন্দিগান আর বাজনার কর্কশতায় ডাক্তারের রক্তে চাপ যায় বেড়ে।

সুগীতা থতমত খেয়ে যায়। রেডিও বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল। নরম গলায় সুগীতা বলল, 'ইস, চটে গেছো বুঝি?'

'চটবার কাজ করলে চটবো না?'

'আ-হা সারাদিন একা থাকি। সময় কাটাতে হবে তো?' সুগীতা অদ্ভুত ভঙ্গি করে দাঁড়াল। 'শুভ-সংবাদ আছে। বলব না তবে।'

শশধর কিছু আঁচ করতে পারল না। কৌতূহলের ঝিলিক ছড়িয়ে পড়ল তার চোখে-মুখে। স্ত্রীর দিকে তাকাল।

হঠাৎ স্ত্রীকে বাহুবেষ্টনীতে আবদ্ধ করে বলল, 'এবার বলো, লক্ষ্মীটি।'

'ছাড়ো। বলছি। সন্তোষ ঠাকুরপো বাড়ি কিনেছে। একটু আগে ফোন করেছিল। তোমাকে আগামীকাল যেতে বলেছে, অতি অবশ্যি।'

কথাটা শুনে শশধরের বেষ্টনী শিথিল হয়ে গেল।

'কোথায় করেছে? ঠিকানা জানো?'

'না। তবে বলেছে, নারকেলডাঙায় শীতলা-মন্দিরের পাশে।'

'হুঁ।'

পরের দিন বেলা এগারোটা। চালক রতন ডাক্তারবাবুর ফিয়েট নিয়ে

এলো গ্যারেজ থেকে। শশধর গাড়ি চেপে সোজা বেলতলায় মোটর ভিহিকেলস অফিসে হাজির হলো। নোট-বুক খুলে ট্যাক্সির নম্বর দেখে নিল। জানতে পারল গাড়ির মালিক গুরুপদ বসাক। তাঁরই পুরনো রোগী। কালিটেম্পল রোডে বাড়ি।

গুরুপদবাবুর বাড়ি পৌঁছে. দরজার বেল বাজাতেই দরজা খুলে সামনে হাজির হলেন গুরুপদবাবু স্বয়ং। তিনি দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করে বললেন, 'আমার কী ভাগ্য!' সাদরে তাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

শশধর সোফায় আর গুরুপদবাবু ইজি চেয়ারে। মুখোমুখি বসলেন। শশধর সৌজন্যমূলক প্রশ্ন করল, 'বলুন, এখন কেমন আছেন?'

গুরুপদবাবু বললেন, 'অনেকটা ভাল। তবে একটু দুর্বল। আপনার দয়ায় এ-যাত্রায় প্রাণ ফিরে পেয়েছি। লোকের এ্যাপিনডিসাইটিস হয়, শুনেছি। উঃ এত যন্ত্রণা। ভাগ্যিস আপনি ঠিক সময়ে অপারেশন করেছিলেন।'

ইতিমধ্যে গুরুপদবাবুর মেয়ে একগ্লাস সরবৎ ও গোটা-চারেক রাজভোগ নিয়ে হাজির হলো।

শশধর বলল, 'এ-সব কী করছেন?

'না না। এমন কিছু না। আপনি আমার জন্যে যা করেছেন। আপনার ঋণ শুধতে পারব না।'

'অসুখ করবে। শুধু সরবৎটা খাব।' বলে শশধর গ্লাসটা নেবার জন্যে হাত বাড়াল।

'ডাক্তারের আবার অসুখ হয় নাকি? মিষ্টিগুলো আগে মুখে দিন তো দেখি।' অষ্টাদশী মেয়ের কথায় প্রতিবাদের ঝড় আর চোখে সোহাগের ধমক।

নিটোল দেহে রূপ-যৌবনের ঢল আর চোখের কোণায় বিজলীর খেলা দেখে শশধরের মন থেকে মুছে গেল হৃদরোগের আতঙ্ক। 'ঠিক আছে।' রুমালে মুখ মুছে শশধর নড়েচড়ে বসল। নিচুগলায় বলল, 'গুরুপদবাবু আমার একটা অনুরোধ আছে।'

গুরুপদবাবু ব্যগ্রভাবে বলে উঠলেন, 'বলুন ডাক্তারবাবু, আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

শশধর বলল, 'ব্যাপারটা ছেলে-চুরির ঘটনা। গতকাল দুপুরে

গ্রে স্ট্রীট থেকে আপনার ট্যাকসি করে একটা বাচ্ছাকে পাচার করা হয়েছে। অবশ্যি আমরা থানা-পুলিশ করিনি, আপনার গাড়ি জেনে। কে চুরি করেছে, আপনার চালক জানে।'

'বলেন কী!' চোখ দুটো বড় বড় করে কপালে তুললেন গুরুপদ-বাবু। 'পরিমল তো কাজ করছে আমার কাছে প্রায় দশ বছর হবে। খুব বিশ্বাসী। কেউ কোনদিন অভিযোগ করেছে বলে মনে পড়ছে না। আচ্ছা, আপনি বসুন। আমি দেখছি।' তিনি বাইরে চলে গেলেন।

একটু পরে গুরুপদবাবু ফিরে এলেন। পিছু পিছু একজন ঘরে ঢুকল। ট্যাকসির চালককে চিনতে দেরি হল না।

পরিমল নমস্কার করে তার সামনে দাঁড়াল। মনে হল সে একটু ঘাবড়ে গেছে। কয়েক মিনিট নির্বাক হয়ে থাকল। তারপর একটু জোর দিয়েই সে বলল, 'দেখুন ডাক্তারবাবু, একটা বাচ্ছাকে আমি নিয়ে গেছলাম ঠিকই। সঙ্গে দুজন ভদ্রলোক ও একজন আধাবয়সী মহিলা। বাচ্ছাটা ছিল ভদ্রমহিলার কোলে। কিন্তু ওনাদের তো আমি চিনি না।'

'বেশ তো, কোথায় নিয়ে গেল বলতে পারবে?'

'ঠিকানা তো বলতে পারবো না। গড়পারে রাস্তার ধারে একটা বস্তি বাড়ি। তবে যে বাড়িতে ওরা ঢুকেছিল, সেটা দেখিয়ে দিতে পারবো।'

'বেশ তাহলেও হবে। তবে চল আমার গাড়িতে।' শশধর ব্যস্ততার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। গুরুপদবাবুকে বলল, 'চলি।'

পরিমল সামনের সিটে আর শশধর পিছনে। গাড়ি ঝড়ের বেগে ছুটে চলল।

একটা মোড় ঘুরতেই পরিমল পিছনে ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, 'সামনে ঐ যে বাঁক দেখছেন, ওখান থেকে দু'কদম গেলেই সেই বস্তি বাড়ি।'

শশধর গাড়ি থামাতে বলল। শশধর ও পরিমল নামল।

পরিমল ইশারায় একটা বাড়ি দেখিয়ে দিল। শশধর তাকে ফিরে গিয়ে গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলল।

শশধর বাড়ির চারপাশটা দেখে নিল। রাস্তার ধারে চায়ের দোকান। দোকানের পিছনে একফালি ফাঁকা মাঠ। মাঠের শেষ প্রান্তে চারখানা ঘর। তিনটি মাঝারি মাপের আর একটি ছোট। ইটের দেওয়াল। টালির ছাউনি। চারচালা। দেওয়াল হালফিল চুনকাম করা। জানলা-দরোজায় সদ্য রঙ মাখানো। হলুদ রঙ। একজন বিবাহিতা মহিলা ছাড়া কাকেও

দেখা গেল না। তিনি ছোট ঘরের সামনে রোয়াকে উঁচু হয়ে বসে তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া দিচ্ছেন তোলা-উনানে। অল্প অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

শশধর চায়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। আহা, দোকানের যা ছিরি! ইটের দেওয়াল। টালির ছাউনি। টালির ফাঁক দিয়ে রোদের ফিন্‌কি। একটা মাঝারি সাইজের টেবিল দেওয়াল-ঘেঁসে পাতা। টেবিল ঘিরে নড়বড়ে দুটো বেঞ্চি। সিমেন্টের মেঝে। নোংরা। টেবিলের তলায় একটা কালো রঙের বেড়াল। গুটিমেরে শুয়ে আছে। রোগা। এঁটো পাতা চেটে চেটে এই হাল। বাঁ দিকে ছোট জানলা। জানলা দিয়ে বস্তি-বাড়ির ঘরগুলো স্পষ্ট দেখা যায়।

শশধর জানলা ঘেঁষে বেঞ্চির উপর বসল। বিশ্রী গন্ধ নাকে ঢুকল। এদিক ওদিক লক্ষ্য করতেই শশধরের নজরে পড়ল একটা মরা টিকটিকি। শশধর সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল।

তখন দোকানে খদ্দের ছিল না। শশধর ডিম আর চায়ের অর্ডার দিল।

সে দোকানদারের ডিম-ভাজার কায়দা লক্ষ্য করছিল। এবার সে মুখ খুলল, 'আচ্ছা ঐ বাড়িতে কে থাকেন বলতে পারেন?'

কপালের ঘাম বাঁ হাতে মুছে দোকানদার উলটে প্রশ্ন করল, 'কেন বলুন তো?'

'না। এমনি জিগ্যেস করছি।'

'আমাদের রাজুদা। দালালি করে।'

'কিসের দালালি?'

'কিসের নয়? বাড়ি? কলকাতার যেখানে-খুশি পেতে পারেন। জায়গা-জমি কেনা-বেচা, পাত্র-পাত্রী—সব রকম। হাসপাতালে বড় ডাক্তার দেখাতে চান? তাও হবে। তবে কমিশন একটু বেশী।'

দোকানদার ডিম-ভাজা ও এক কাপ চা টেবিলের উপর রাখল। ঘরের কোণে বড় মাটির জালা থেকে জল আনল। বলল, 'তা আপনি কী বাড়ি-ভাড়া খুঁজছেন?'

'হুঁ। সস্তায় একটা বাড়ি কিনব। রাজুদাকে একবার ডেকে দিতে পারেন?'

'আচ্ছা, দেখছি। আপনি ততক্ষণ খান।' দোকানদার বাইরে চলে গেল।

একটু পরে ফিরে এসে বলল, 'এখন বাড়িতে নেই। একটু বসুন। হয়ত এসে যেতে পারে।'

শশধর বলল, 'আপনার ডিম-ভাজা কী চমৎকার!'

'হ্যাঁ বাবু, টাটকা ডিম। খাঁটি গণেশ তেলে ভাজা।'

'আচ্ছা, রাজুদার বাড়িতে কাকেও ত দেখছি না! কেউ থাকে না?'

'কেন? ওনার স্ত্রী রয়েছেন। আর একটি ছেলে। ইস্কুলে গেছে।'

ইত্যবসরে এক ভদ্রলোক দোকানে ঢুকল। পাজামা আর কোর্তা-পরা। নাক খেঁদা। সাদা-কালো চুলের ঢল কাঁধের ওপর। বয়েস পঞ্চাশের কিছু বেশী। ফনফনে চেহারা, তোবড়ানো গাল আর চোখ দুটো গর্তে ঢোকা। তবে জলজলে। নাকের নীচে গোঁফের বাহার।

ভদ্রলোক আসতেই দোকানদার বলে উঠল, 'এইতো রাজুদা এসে পড়েছে। ইনি আপনাকে খুঁজছেন।'

রাজুদা হাত দুটো কপালে ঠেকাল। শশধরও প্রতি-নমস্কার করল।

'একটা বাড়ি কিনতে চাই।'

'কতোর মধ্যে?'

'এই ধরুন, তিরিশ-চল্লিশ।'

'বেশ। তা কোথায় চান?'

'কাছাকাছি হলেই হবে।'

'ইস্, আগে যদি বলতেন। নারকেলডাঙায় বাগান-সমেত একটা বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। শীতলা-মন্দিরের কাছে। একেবারে জলের দামে।'

'তাহলে?' শশধর হতাশ স্বরে বেজে উঠল।

'আচ্ছা দেখছি কী করা যায়। আপনি বরং কাল দুপুরে আসুন।'

'ঠিক আছে। তাই আসব।' শশধর ডিম-ভাজা ও চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে বিদায় নিল।

ফিরে গিয়ে নিজের গাড়িতে বসল। পথিমধ্যে পরিমলকে বিদায় দিল। গাড়ি ছুটল নারকেলডাঙায়। এদিকের রাস্তাঘাটের সঙ্গে বড়-একটা পরিচয় নেই শশধরের। রাস্তা ফাঁকা খাঁ খাঁ করছে। জনমনিষ্যি নেই। হঠাৎ দেখা হল এক ছোকরার সঙ্গে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। গাড়ি ব্রেক ক'ষে দাঁড়াল। শশধর মুখ বাড়িয়ে জিগোস করল, 'আচ্ছা শীতলা মন্দির কতদূরে?'

ছেলেটি বলল, 'একটু এগিয়ে যান। একটা মোড় পাবেন। বাঁদিকে

সরু রাস্তা। তবে গাড়ি ঢুকবে না। মিনিট পাঁচেক হাঁটা দেবেন। দেখতে পাবেন।'

শশধর ছোকরার নির্দেশ মত এসে মন্দির দেখতে পেল। গাড়ি থেকে নেমে মন্দিরের ভিতর উঁকি মারল। তেল সিঁদুর মেখে ঠাকুর দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে। মন্দিরের রোয়াকে বসে আছে গৌরবর্ণ সৌম্যদর্শন এক প্রৌঢ়। কপালে তিলক আর গলায় কণ্ঠী, বোষ্টম। খঞ্জনী বাজাচ্ছে ঠিন ঠিন ঠিন।

বোষ্টমের কাছে সন্তোষের বাড়ির খোঁজ করল শশধর। বোষ্টম, ডান হাততুলে দেখিয়ে দিল সন্তোষের বাড়ি।

শশধর এগিয়ে গেল। তার নজরে পড়ল গাছগাছালি-ভরা একটা বাগান ঠিক রাস্তার ধারে। চারদিকে বুক-সমান উঁচু দেওয়াল। একপাশে একটা দরজা।

ঠক-ঠক-ঠক দরজায় ঠোকা দিল, শশধর। সাড়া পাওয়া গেল না। অগত্যা সে জোরে কড়া নাড়ল। এবার দরজা খুলে গেল। শশধরকে হঠাৎ দেখে রমা হকচকিয়ে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'আরে ঠাকুর পো? ভেতরে আসুন।' রমা শুষ্ক অভ্যর্থনা করে।

শশধরের মনে হল, ক'দিনের মধ্যে যেন রমার বয়েস অনেকটা বেড়ে গেছে। শশধর রমার পিছে পিছে হাঁটতে লাগল বাগানের মধ্যে সরু রাস্তা দিয়ে। এক পাশে একটি বাড়ি। একতলা। ইঁটের দেওয়ালে বাইরের দিকে সবুজ শেওলার পলেস্তারা। ভিতরে ছোটখাট ড্রইং রুম।

তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে। শশধর ড্রইং রুমে সদ্য পালিশ করা একটা কাঠের চেয়ারে বসল। রমার শাশুড়ী ও সুবোধ পাশের ঘরে শুয়ে। সন্তোষ তখনও ফেরে নি।

'একটু বসুন ঠাকুরপো। চা নিয়ে আসি।'

দেওয়াল হালে চুনকাম করা। কিন্তু জানলা-দরজার যা ছিরি। অনেকদিন রঙের মুখ দেখেনি। চড়া রোদ খেয়ে খেয়ে পাল্লাগুলো ফেটে ফেটে গেছে। গরাদগুলো জং-এর অত্যাচারে জরাজীর্ণ। ঘরের মধ্যে টেবিল, খান-তিনেক বেতের চেয়ার, একটা কাঁচের আলমারি, ছাইদানি, ফুলদানি, ক্যালেণ্ডার আরো খুঁটিনাটি জিনিস এলোমেলোভাবে এখানে-ওখানে ছড়ানো। ঘর জুড়ে বিষাদের ছায়া। শশধর মনের ভিতর প্রচণ্ড শূন্যতা অনুভব করল। এমন সময় রমা কাপ ডিস টেবিলের উপর রেখে বলল, 'দেরি হয়ে গেল। কিছু মনে করবেন না।'

'না, না। বরং তোমার দুপুরে ঘুম···। শান্তিতে ব্যাঘাত হল তো?'

'হুঁ শান্তি! কী যে বলেন? শান্তি বলে কী কিছু আছে দুনিয়ায়?' রমা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'কেন? অশান্তি কোথায় দেখলেন?'

'সে কি! কিছু শোনেন নি?'

'না তো।'

রমা তখন সবিস্তারে ছেলে চুরির ঘটনা বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

শুনে, শশধর বলল, 'হুঁ দুঃসংবাদ। তবে একটা কথা বুঝতে পারছি না। শঙ্করকে জড়ালেন কেন?'

রমা বলল, 'আপনার বন্ধু জানে। আমি তো বারণ করেছিলুম।'

এমন সময় সন্তোষ টলোমলো অবস্থায় হাজির হল।

শশধর জিগ্যেস করল, 'আবে কী হলো? জ্বর নাকি?'

সন্তোষ বলল, 'কী জানি? অসহ্য মাথার যন্ত্রণা। দাঁড়াতে পারছি না।'

সন্তোষ বিছানার উপর শুয়ে পড়ল। রমা কম্বল এনে তার গায়ে চাপিয়ে দিল। সন্তোষের মা ছুটে এলো।

ডাঃ শশধর পরীক্ষা করল। সত্যি জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। সে বলল, 'ভয় নেই। মনে হয় ফ্লু। ওষুধ খেলেই সেরে যাবে। আসছি।'

বলে শশধর বেরিয়ে গেল।

কাছাকাছি কোন ওষুধের দোকান নজরে পড়ল না। শশধর গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল মানিকতলা। সেখান থেকে ওষুধ কিনে আনল।

রমার হাতে ওষুধগুলো দিয়ে কোন্‌টা কখন খেতে হবে বুঝিয়ে দিল শশধর। তারপর বিছানার উপর বসে সে সন্তোষের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

'আমি একা। কী করবো? কোন ভরসা পাচ্ছি না।' রমা শঙ্কা প্রকাশ করল।

'বলছি তো কোন ভাবনা নেই। আমি বরং কাল এসে দেখে যাবো। এখন উঠি।'

সন্তোষের মা বললেন, 'তাই এসো, বাবা।'

পরের দিন নার্সিং হোমের কাজ সেরে শশধর উপস্থিত হল রাজুদার বাড়ি। সঙ্গে গেল পল্টু। নার্সিং হোমের একজন কর্মচারী। শশধরের একান্ত বিশ্বাসী।

রাজুদাকে পাওয়া গেল না। অগত্যা শশধর চায়ের দোকানে ঢুকল। গতবারের মত দুই কাপ ও ডিম-ভাজার অর্ডার দিয়ে দুজনে চেয়ারে বসল।

দোকানদার নিজে থেকে বলল, 'রাজুদা আজ মেডিকেল কলেজে গেছে। একপাল রোগী নিয়ে। ফিরতে বোধ হয় একটু দেরি হবে।'

শশধর জিগেস করল, 'আচ্ছা রোগীরা তো নিজেরা হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার দেখাতে পারে। দালাল ধরা কেন?'

দোকানদার বলল. 'আপনি বুঝি জানেন না?'

শশধর স্বীকার করল, 'না তো।'

দোকানদার ডিম ভাজতে ভাজতে একটা বিড়ি ধরাল। বলল, 'ওখানে খুদে-ডাক্তাররা রোগী ভাগিয়ে দেয়। শুধু একটা কী দুটো রোগী রেখে দেয় বড়-ডাক্তারেব জন্যে। বড়-ডাক্তার আসেন বেলা করে। এক পাল হবু-ডাক্তার তাঁকে ছেঁকে ধরে। তখন তাঁর নির্দেশে ছোকরাগুলো রোগীর উপর চালায় অত্যাচার। পুলিশের ভাষায় যাকে বলে থার্ড ডিগ্রী।'

'বাজে কথা।'

'না বাবু, সত্যি।'

দোকানদার বলল, 'নিজের চোখে দেখা। তাই তো লোকে রাজুদার কাছে আসে।'

শশধর তামাসা করে বলল, 'রাজুদা বড় ডাক্তারকে সেলামী দেয় নিশ্চয়ই।'

'তা জানি না বাবু। তবে বড়-ডাক্তারবাবুরা রাজুদাকে বেশ খাতির করে। তাব রোগী ভাল করে দেখে দেয়। হাসপাতাল থেকে ওষুধ পেতেও কোন অসুবিধে হয় না।'

'তা তোমার রাজুদা রোগীদেব কাছ থেকে কীরকম 'দক্ষিণা পায়?'

দোকানদার একগাল হেসে বলল, 'মাথা-পিছু তিন-চার টাকা। আবার কেউ খুশি হয়ে তারও বেশী।'

'বল কী।' শশধর বিস্মিত হয়ে বলল।

'এই তো সেদিন। ইয়ে গত পরশু দিনই হবে। এক ভদ্রমহিলা আমার চোখের সামনে এক তাড়া দশ টাকার নোট রাজুদার হাতে গুঁজে দিল। আবার বলল কি না, পরে আরও কিছু দেব।'

'এত টাকা!'

দোকানদার লম্বা টান দিয়ে বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'এক বর্ণ

মিথ্যে নয় বাবু। একটা বাচ্চার একটা আঙুল কেটে বাদ দিতে হবে। ঐ মহিলার বুঝি নাতি। অনেক খরচা। তাই রাজুদাকে ধরেছে।'

শশধর জিগেস করল, 'তা আঙুল কাটতে হবে কেন?'

দোকানদার দু' প্লেট ডিম-ভাজা টেবিলের উপর রেখে বলল, 'ঐ বাচ্চার ছ'টা আঙুল। ডান হাতে জোড়া-বুড়োআঙুল যে অপয়া!'

চকিতে সন্তোষের বাচ্চার ডান হাতখানা শশধরের চোখের সামনে ভেসে উঠল। 'তা তুমি কী করে জানলে?'

দোকানদার কাপে চিনি দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলল, 'দোকান থেকে দুধ নিয়ে গেছিলুম, বাচ্চাটা খাবে বলে। আর তখনই তো নজরে পড়ল।'

শশধর ও পল্টু ডিম-ভাজা শেষ করে সবেমাত্র কাপে ঠোঁট ঠেকিয়েছে, এমন সময় রাজুদা হাজির।

রাজুদা নমস্কার করে বলল, 'আমি দুঃখিত। সময় করে উঠতে পারিনি। আপনি দিন-চারেক পরে আসুন। একটা ভাল বাড়ি দেখছি।'

শশধর বলল, 'ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি কিছু নেই।'

'এখনও স্নানাহার হয়নি। চলি নমস্কার।' রাজুদা বাড়ির ভিতর চলে গেল।

শশধর ও পল্টু মোটর গাড়িতে ফিরে গেল। কিছুক্ষণ পরে সন্তোষের বাড়ির দোরগোড়ায়। চালক বার-দুয়েক জোরে হর্ণ বাজাল। শশধর ও পল্টু গাড়ি থেকে নেমে পড়ল।

আচমকা পাঁচ-ছ জন চ্যাংড়া শশধরকে ঘিরে ফেলল। এক ছোকরা এগিয়ে এলো। হাতে তার চাঁদা-আদায়ের বিল বই। শশধর বলল, 'কিসের চাঁদা?'

'মা শীতলার জন্মদিন।' সে পাঁচ টাকার রসিদ কেটে শশধরের হাতে ধরিয়ে দিল।

'ঠিক জানো তার জন্মদিন?'

'আলবত। ছাড়ুন দিকি।'

টুসকি-বাজি ধরল কোমর দোলাতে দোলাতে।

ভঙ্গিটা খারাপ। হুজ্জোত হতে পারে। শশধর পাঁচ টাকা দিয়ে রেহাই পেল।

রমা দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে। দেখছিল বেয়াড়া ছেলেগুলোর বেয়াদবি। তাকে দেখে শশধর অনুযোগের স্বরে বেজে উঠল। 'চমৎকার

জায়গায় বাড়ি কিনেছেন। এখানে বাস করেন কি করে?'

রমার মুখ লাল। বলল, 'আসুন।'

তার পিছু পিছু শশধর সন্তোষের ঘরে ঢুকল। সন্তোষ তখন পা ছড়িয়ে বিছানার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে। মা কপালে জলপটি দিচ্ছেন।

শশধর নাড়ী দেখল। উত্তাপ পরীক্ষা করল। গা পুড়ে যাচ্ছে। জ্বর চার। চোখ দুটো লাল। দুদিকে কুঁচকির গ্রন্থি ফোলা। হঠাৎ সন্তোষ হাত দুটো ছুঁড়তে লাগল। 'হ্যাট হ্যাট।' রমা ঝুঁকে জিগ্যেস করল, 'কী বলছ?' 'বাগানে একপাল গরু।'

'গরু! কই না তো। দরোজা বন্ধ।'

'হ্যাট্ হ্যাট্। ফুলগাছ মুড়োচ্ছে।'

বউদি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'কী হবে ঠাকুরপো?'

শশধর বলল, 'ও কিছু না। প্রলাপ। ঘাবড়াবার কিছু নেই। জ্বর কমানোর বড়িটা খাওয়ান তো দেখি।'

সন্তোষ হাঁ করল। রমা জল ঢেলে দিল। তারপর বড়ি। সন্তোষ একটা হেঁচকি তুলে হড়হড় করে বমি করল। শশধর সন্তোষের মুখে-চোখে জলের ঝাপটা মারল। রমা ডেটল জল ঢেলে বমি পরিষ্কার করল।

সন্তোষ এবার জোর ঢেঁকুর তুলল। ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকাল। ভাবলেশহীন দৃষ্টি। রমা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

'উহুঁ। অত উতলা হবেন না। মনে হচ্ছে অসুখটা বাঁকা। ওষুধে বাগ মানছে না। এখনই আমার নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে হবে।'

শশধর, পল্টু, গাড়ির চালক—তিনজনে ধরাধরি করে সন্তোষকে গাড়ির পিছনের সিটে শুইয়ে দিল। রমা স্বামীর মাথা কোলে তুলে নিয়ে বসল।

নার্সিং হোমে শশধর আবার পরীক্ষা করল। অণ্ড দুটি ফোলা। ভীষণ টাটানো। অণ্ডকোষের মূলে (Root of the scrotum) সেলাই এর দাগ। শশধর বুঝতে পারল অরকাইটিস রোগের আক্রমণ। আর সেলাই-এর দাগ? তবে কী সন্তোষ জন্মনিয়ন্ত্রণ (ভ্যাসেকটমি) করেছে? তাই নিশ্চিন্ত হবার জন্যে শশধর দু'দিকের শুক্রনালি (ভাস্ ডিফারেন্স) সেটা রয়েছে স্পার্মাটিক কর্ড-এর পিছনে, আস্তে আস্তে টিপে দেখল। আঙুলে ঠেকল দুটো গাঁট। এতেই শশধরের সন্দেহ দূর হল।

পরের দিন বেলা দশটায় শশধর কেবিনে ঢুকল। রোগীকে পরীক্ষা

করতে গিয়ে সে অবাক। অসুখের যে চাকা দুরন্ত বেগে ঘুরছিল, সেটা হঠাৎ থেমে গেছে। জ্বর কমেছে। অসম্ভব ঘাম হচ্ছে। ফুল স্পীডে ফ্যান চালিয়ে দেওয়া হল। জামা পাল্টানো হল। নাড়ি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি স্বাভাবিক। অঙ্গের টাটানি অনেক কম। চোখের চাহনি বদলে গেছে। শশধর হেসে বলল, 'যাক বাঁচা গেল। সেরে গেলি।'

সন্তোষ উদাসভাবে বলল, 'প্যাঁচ খেলতে খেলতে তুই আমার ঘুড়ি কেটে দিয়েছিলি। আমি কেঁদে ফেলেছিলুম। তখন তুই ঠাট্টা করতে ছাড়িস নি। মনে আছে?'

'খুব। কিন্তু ও-সব ফালতু কথা এখন নয়।'

সন্তোষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ফালতু না রে। ঐ প্যাঁচকাটা ঘুড়ির মতো আজ আমার জীবনের সুতো কেটে গেছে। আমি গোঁৎতা খেয়ে পড়ে গেছি।'

'দূর। যতসব আজে-বাজে চিন্তা। আজই তোকে ভাত দেব।' বলে শশধর বাইরে চলে গেল।

পরের দিন। সন্তোষ খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানার উপর সোজা হয়ে বসে নার্স মানসীর সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। শশধর মানসীকে কয়েকটা ওষুধ আনতে বলল, মানসী ঝটিতে চলে গেল। শশধর হেসে বলল, 'গোঁৎতা খেয়ে ত পড়ে গেছলি। আবার ওপরে উঠলি কী করে? মানসীর ধারালো কাজলের ধাক্কা খেয়ে বুঝি?'

সন্তোষও রসালাপে যোগ দিয়ে হাসল।

শশধর বলল, 'সুখের সময় মানুষ তো হাসবেই। কিন্তু দুঃখের দিনে ক'টা লোক হাসতে পারে? দুঃখে হাসাই হলো আসল হাসা।'

সন্তোষ বলল, 'তোর কথার মাথামুণ্ডু নেই। মনে আনন্দ না থাকলে মানুষ কী হাসতে পারে? অসুখের ঘোরে বেশ সুখেই ছিলাম। রোগ সারিয়ে তুই আমায় ফের দুঃখের মধ্যে টেনে আনলি। হাসতে পারছি না রে।'

শশধর বলল, 'এখন চলি। তুই ঘুমো। সন্ধ্যের পর কথা হবে।'

সন্ধ্যার পর শশধর আবার এল।

সন্তোষ বললে, 'সংসারে বড্ড আটকে গেছি রে। বেরুতে পারছি না। একটা পথ বাতলাতে পারিস?'

শশধর বলল, 'দেখ ঘরবাড়ি, স্ত্রী-পুত্র—এসবকে সংসার বলে না। এদের প্রতি আসক্তিই হলো সংসার। যতক্ষণ আসক্তি থাকবে ততক্ষণ সংসার

থাকবে। পালাবার রাস্তা নেই।'

'এভাবে পারছি না রে।'

শশধর বলল, 'স্বাভাবিক। জলজ্যান্ত ছেলেটা চুরি হয়ে গেল। বাবার মনে দাগা লাগবে বৈকি!'

সন্তোষ নতমুখে খানিক চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'মনের ভেতরটা বড্ড অন্ধকার ঠেকছে।'

শশধর বলল, 'কেন? আলো জ্বাললে তো অন্ধকার পালাবে। আসলে তোর শ্মশান-বৈরাগ্য। ভুলে যাবি। অতীতকে ভুলে যাওয়াই হলো ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার সঞ্জীবনী।'

এমন সময় হঠাৎ নার্সিং হোমের বাতিগুলো নিবে গেল। শশধর বিরক্ত হয়ে চিৎকার শুরু করল, 'এই পল্টু, দেখ, কোথায় কী গোলমাল হল?'

'ডাক্তারবাবু লোড-শেডিং।' পল্টুর গলা শোনা গেল।

'যাচ্ছেতাই।' শশধর বলল, 'এভাবে বসে থাকা যায়? বরং শোনা যাক বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডাঃ বসুর জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বক্তব্য।'

এই বলে ব্যাটারি-চালিত টেপ-রেকর্ডার চালিয়ে দিল।

'সুখী পরিবার গড়তে হলে দু-তিন সন্তানের পরই জন্ম নিয়ন্ত্রণ দরকার। মেয়েদের লাইগেসন আর পুরুষদের বেলায় ভ্যাসেক্টমি হলো বিজ্ঞান-সম্মত পন্থা। অনেকের বিশ্বাস এতে ভবিষ্যতে কুফল ফলে। একেবারে ভ্রান্ত ধারণা। মানসিক বা শারীরিক কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই।

তবে হ্যাঁ, ভ্যাসেক্টমি অপারেশনের পরও পুরুষের সন্তান-উৎপাদনের ক্ষমতা থাকে। সকলেরই এটা জানা প্রয়োজন। জানা না থাকলে স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে অযথা সন্দেহ জন্মাতে পারে। তাতে সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হয়। সন্তান-উৎপাদনের ক্ষমতা কেন থাকে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই রকম।

প্রথমে স্পার্ম বা শুক্রকীটের গতিপথ বলি।

শুক্রকীটের উৎপত্তি স্থান হলো অণ্ডের গর্ভে নিহিত টিউবিউলস্। অণ্ডের পিছনে আছে এপিডিডিমিস। এটির সঙ্গে অণ্ডের যোগ আছে সরু সরু নালীর মাধ্যমে (ইফারেন্ট ডাকটিউলস)। এপিডিডিমিসের নালী শুক্রনালীর (ভাস্ ডিফারেন্স) সঙ্গে সংযুক্ত। শুক্রনালী, শিরা, ধমনী ও স্নায়ু-সূত্র একসঙ্গে যে নালীতে থাকে, তাকে বলে স্পার্মাটিক কর্ড। এটি

ইনগুইনেল ক্যানেল নামক সুড়ঙ্গপথে পেটের মধ্যে প্রবেশ করে। তারপর শুক্রনালী, শুক্রস্থলীর (সেমিনল ভেসিকুল) নালীর (ডাক্ট) সঙ্গে মিশে সৃষ্টি করে ইজাকুলেটরি ডাক্ট নামে একটি নালী। এটি প্রোস্টেট গ্রন্থির মধ্য গিয়ে মূত্রনালীতে শেষ হয়।

শুক্রকীট অণ্ড হ'তে নির্গত হয়ে শুক্রনালীর মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। শেষে শুক্রস্থলীর নালীর ভিতর দিয়ে শুক্রস্থলীতে এসে বাসা বাঁধে। যৌন উত্তেজনায় শুক্রকীট শুক্র বা বীর্যের সঙ্গে মূত্রনালীর মধ্য দিয়ে বাইরে আসে। বীর্য তৈরী হয় তিনটি নিঃসবণের সংমিশ্রণে। তা হলো :

ক) অণ্ডের নিঃসরণ

খ) শুক্রস্থলীর নিঃসরণ

গ) প্রোস্টেট গ্রন্থির নিঃসরণ

বীর্যে শুক্রকীট থাকে অসংখ্য। এটির আছে চারটি অংশ। যথা মাথা (এটি একটা ক্যাপ বা টুপি ঢাকা। গলা, দেহ ও লেজ। লেজের সাহায্যে এরা নড়াচড়া করে। একটিমাত্র শুক্রকীট সুপক্ক ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে গর্ভ সঞ্চার করে। প্রবেশের পর এর লেজ খসে যায়।

ভ্যাসেকটমি মানে শুক্রনালীর মধ্যস্থ সুড়ঙ্গ পথ বন্ধ করে দেওয়া। এটি করা হয় ইনগুইনেল ক্যানেলের নিচে অর্থাৎ অণ্ডকোষের মূলে (Root of the scrotum) সুড়ঙ্গ পথ বন্ধ করলে শুক্রকীট আর এই নালীর মধ্য দিয়ে শুক্রস্থলীতে আসবার সুযোগ পায় না। তাই গর্ভ সঞ্চার হয় না। কিন্তু কথা হলো শুক্রস্থলীর ভিতর কিছু শুক্রকীট বাসা বেঁধে থাকতে পারে অপারেশনের আগে থেকে এবং সেখানে থাকতে পারে প্রায় ছ'মাস পর্যন্ত। অপারেশনের পর শুক্রকীট ডিম্বে প্রবেশ করে যদি গর্ভ সঞ্চার করে, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।'

শশধর টেপরেকর্ড বন্ধ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক আলো জলে উঠল।

'এখনি বাড়ি যাব।' সন্তোষের গলার স্বর ভারি ভারি।

'কী হল? হঠাৎ বাড়ী? এখনও তোকে দু-তিন দিন এখানে থাকতে হবে।'

'আঃ ছেড়ে দে।' সন্তোষ আচমকা উঠে দাঁড়াল। ছিটকে বেরিয়ে গেল।

শশধরও চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। দৌড়ে চেম্বারের বাইরে এলো। না। সন্তোষ তখন চোখের আড়ালে।

শশধর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আপন মনে বলে উঠল, 'যাক, ওষুধে তাহলে ফল ধরেছে।' জোর গলায় সে হাঁকল, 'পল্টু'।

খাঁকি প্যান্ট, খাঁকি হাফশার্ট আর ক্যাম্বিসের জুতো-পরা ষণ্ডামার্কা ছেলেটি ডাঃ শশধরের ডান হাত। যেন সুইচ অফ করে সেই-তো রহস্যের চাবিকাঠি তুলে দিল শশধরের হাতে।

শশধর তার পিঠ চাপড়ে বলল, 'সাবাস। এখনও একটা কাজ বাকি। শিগগির যাবি। ট্যাক্সি নিবি।'

রাজুদার বাড়ি যাবার জন্যে তাকে নির্দেশ দিল। 'মনে আছে তো কি-কি বলেছি?'

'সব।' পল্টু ঘাড় নাড়ল।

খানিক বাদে রমা নার্সিং হোমে হাজির হলো। চোখে মুখে তার উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের ছাপ।

শশধর একনজরে তাকে দেখে নিয়ে বলল, 'ইস্ আর-একটু আগে এলে একেবারে জোড়ে যেতে পারতেন।'

'মানে?' চমক খাওয়া গলায় রমার জিজ্ঞাসা।

'সোজা বাংলা ভাষা। না-বোঝার কিছু নেই। সন্তোষ এতক্ষণে বোধ হয় বাড়ি পৌঁছে গেছে।'

'বলেন কী ঠাকুরপো। আমি যাই।'

প্রায় ঘণ্টা দুই বাদে পল্টু ফিরে এলো। হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে সে বলতে শুরু করল, 'দোকানের পাশে বটগাছটার আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম। দেখি রাজুদা সন্তোষবাবুকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল। পিছু নেব বলে আমিও ট্যাক্সি হাঁকিয়ে দিলাম। কিন্তু কোন্ দিকে যে গাড়িটা উধাও হয়ে গেল বুঝতে পেলাম না।'

'ঠিক আছে। তুই যা।'

সন্ধ্যের একটু পরে টেলিফোন বেজে উঠল। শশধর রিসিভার তুলে নিল। ওদিক থেকে শঙ্করের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

'হ্যালো শশধর। আজ একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। এখুনি। একটু আগে।'

'কী ব্যাপার?'

'সন্তোষের হারানো মানিক ফিরে এসেছে। এইমাত্র। অক্ষত অবস্থায়। তবে জোড়া-আঙুলের একটা খোয়া গেছে। সন্তোষ কেস তুলে আমার হাত ধরে মাপ চেয়ে নিয়েছে।'

'তা তো বুঝলুম। আসলে চোর কে? বুঝতে পারলি?' শশধর জিগ্যেস করল।

'না তো।'

'বিয়ে না করলে পুরুষের চোখ ফোটে না। তোর একটা বিয়ে করা দরকার। হাঃ হাঃ হাঃ।' শশধর রিসিভার নামিয়ে রাখল।